ভাষা আন্দোলনের শহীদেরা

ভাষা-আন্দোলন বাঙালির ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ই আগস্ট ১৯৪৭) কয়েক মাস পরেই শাসকশ্রেণি উর্দুকে দেশের একক রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। বাঙালিরা উর্দুর পাশাপাশি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতদানের দাবি জানায়। এ দাবি প্রত্যাখ্যান করা হলে পূর্ব বাংলায় ভাষা-অন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি এ আন্দোলন অগ্নিময় রূপ ধারণ করে। অর্ধসপ্তাহকাল (২১-২৪শে ফেব্রুয়ারি) ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঢাকায় ছাত্র-জনতা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ধ্বনি তুলে হরতাল পালন, সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠান ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পুলিশের গুলিতে নিহত হন আবুল বরকত, রফিকউদ্দিন আহমদ, শফিউর রহমান, আবদুস সালাম, আবদুল জব্বার ও আরো অনেক তাজা প্রাণ। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য তাঁদের এই জীবন বিসর্জন ইতিহাসের এক বিরল ঘটনা। তাই তাঁরা ভাষা-শহীদ হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছেন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে তাঁদের জীবনচরিতসহ ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস উপস্থাপিত হয়েছে।

ভাষা-আন্দোলন বিষয়ক বাংলা একাডেমির অন্যান্য প্রকাশনা

একুশের সংকলন '৮০ ও '৮১ : স্মৃতিচারণ
ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস : কয়েকটি দলিল
ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ : কতিপয় দলিল [১ম ও ২য় খণ্ড]
একুশের সাহিত্য : নাটক
Twenty First February Speaks for All Language
শহীদ মিনার
ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস
সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে
ভাষা-আন্দোলনের স্মৃতি ও কিছু জিজ্ঞাসা
প্রাণের মিনার শহীদ মিনার
ভাষা-আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস
ভাষা-আন্দোলনের দলিলপত্র
একুশের প্রবন্ধ
ভাষাশহীদ আবদুস সালাম
ভাষাশহীদ আবুল বরকত
ভাষাশহীদ রফিকউদ্দিন আহমদ
ভাষাশহীদ শফিউর রহমান
ভাষাশহীদ আবদুল জব্বার

ভাষা-আন্দোলনের শহীদেরা

সম্পাদনা পরিষদ

শামসুজ্জামান খান
বশীর আল্‌হেলাল
সেলিনা হোসেন
সুকুমার বিশ্বাস
শফিকুর রহমান চৌধুরী
নূরুল ইসলাম

বাংলা একাডেমি ঢাকা

বাএ ৫৪৭২

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৯৭/ফেব্রুয়ারি ১৯৯১। পাণ্ডুলিপি : সংকলন উপবিভাগ, বাংলা একাডেমি। প্রথম পুনর্মুদ্রণ : মাঘ ১৪১৬/জানুয়ারি ২০১০। দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ : পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ, অগ্রহায়ণ ১৪২২/ডিসেম্বর ২০১৫। প্রকাশক : ড. জালাল আহমেদ, পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), বিক্রয়, বিপণন ও পুনর্মুদ্রণ বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১০০০। মুদ্রক : ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমি প্রেস, ঢাকা। প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী। মুদ্রণ সংখ্যা : ২২৫০ কপি। মূল্য : ১০০.০০ টাকা।

BHASHA ANDOLANER SHAHIDERA [The Martyrs of the Language Movement], Edited by Shamsuzzaman Khan and Others. Published by Dr. Jalal Ahmed, Director (in-charge), Sales, Marketing and Reprint Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. Second Reprint : Reprint Sub-Division, December 2015. Price : Taka 100.00 Only.

ISBN 984-07-5481-5

উৎসর্গ

বায়ান্নপরবর্তী
সকল গণ আন্দোলনের
শহীদদের উদ্দেশে

প্রসঙ্গ-কথা

আমাদের ভাষা-আন্দোলন সংক্রান্ত সাহিত্য যার মধ্যে রয়েছে বৃহদায়তন গ্রন্থ, পুস্তক-পুস্তিকা, একুশের সংকলন, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, স্মৃতিচারণ, গল্প-উপন্যাস, কবিতা, ছড়া ইত্যাদি এ-যাবৎ কম রচিত ও প্রকাশিত হয়নি। কেউ কেউ খেদ করেন, ভাষা-আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হলো না। কিন্তু ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাসের অন্তত দু'টি বৃহৎ গ্রন্থ রচিত হয়েছে যার একটি বাংলা একাডেমী প্রকাশ করেছে। ভাষা আন্দোলনের দলিলের কয়েকটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। তার তিনটি বাংলা একাডেমী প্রকাশ করেছে। তবে এই খেদ থেকে বোঝা যায় ভাষা-আন্দোলন, তার ইতিহাস ও নানা প্রসঙ্গ এবং ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কিত সাহিত্য বিষয়ে আমাদের তৃষ্ণা ও আগ্রহ কত গভীর ও ব্যাপক। ভাষা-আন্দোলনের স্মৃতি যেমন কখনো মুছে যাবে না, এর আবেগ কখনো শেষ হবে না, তেমনি এর সাহিত্য ও লেখালেখির প্রয়োজন ও চাহিদাও কখনো মিটবে না। ভাষা-আন্দোলনের শহীদদের জীবনী সংকলনের একটি পরিকল্পিত উদ্যোগ সম্ভবত এর আগে গৃহীত হয়নি। বর্তমান গ্রন্থটি সেই অপূর্ণতার কথা মনে রেখেই পরিকল্পিত। খুব স্বল্প সময়ে বইটি প্রকাশ করতে হয়েছে বলে এই বই যতটা নিখুঁত হওয়া উচিত ছিলো হয়তো তা করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে নানা মহলের সহযোগিতায় এই বইটি পরিপূর্ণতা লাভ করবে বলে আমরা আশা করি। এ ব্যাপারে আমরা সকলের সহযোগিতা কামনা করি। শহীদদের প্রতি আমাদের হৃদয়-নিংড়ানো ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদনই এই ছোট বইটির উদ্দেশ্য। বইটি পাঠকের ভালো লাগলেই এবং তাঁদের মনে শহীদ-স্মৃতি জাগরূক করতে বিন্দুমাত্র সহায়তা করলেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

এই গ্রন্থ প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

বাংলা একাডেমী
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ
মহাপরিচালক

ভাষা-আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ আজ স্বাধীন, সার্বভৌম। আমরা গান গাই : 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।' কিন্তু এ-দেশ চিরকাল স্বাধীন ছিল না। বার বার এই সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বাংলার উপর হামলে পড়েছে বিদেশি শাসক-শোষক, বিদেশি ইংরেজ প্রায় দু'শ বছর পরাধীন করে রেখেছে এ দেশকে। তখন একটা গোটা দেশ ছিল ভারতবর্ষ, তার প্রদেশ ছিল বাংলাদেশ। স্বাধীনতার দীর্ঘ লড়াই লড়ে ইংরেজকে তাড়িয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন করা হয়। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সে লড়াই ঐক্যবদ্ধভাবে এক-প্রাণ হয়ে লড়তে পারে নি। ১৯৪৭ সালে জঘন্য সাম্প্রদায়িক হানাহানির মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো। কিন্তু দেশটা দুই ভাগ হয়ে গেল : ভারত আর পাকিস্তান। পাকিস্তানের আবার দুই অংশ : পশ্চিম পাকিস্তান আর পূর্ব পাকিস্তান। এই দুই অংশের মাঝখানে হাজার মাইলের ব্যবধান। সেই পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলা আমাদের আজকের 'বাংলাদেশ'।

যখন পাকিস্তান হলো, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ, তারা বাঙালি, আশা করল এবার সুখ-শান্তি হবে, শোষণ অত্যাচার বন্ধ হবে। কিন্তু কই, মানুষের স্বপ্ন আশা সব ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেল। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, সংস্কৃতি সবদিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে দাবিয়ে রাখল। এক খুলনাতেই বিশ হাজারের বেশি মানুষ দুর্ভিক্ষে মারা গেল।

ওই যে সংস্কৃতির কথা বলেছি, বাঙালির ওই সংস্কৃতিকেই ওরা ধ্বংস করে দিতে চাইল। সংস্কৃতি হচ্ছে একটা জাতির ভাষা সাহিত্য শিক্ষা জ্ঞানচর্চা সঙ্গীত শিল্প অভ্যাস ঐতিহ্য সংস্কার এইসব। এই সংস্কৃতি দিয়েই তো একটা জাতির, তার মানুষের পরিচয়। তাছাড়া সংস্কৃতি না থাকলে অর্থ-বিত্তও হয় না। যার শিক্ষা নেই, সংস্কৃতি নেই তাকে শোষণ করা সোজা।

সংস্কৃতির প্রধান অবলম্বন ভাষা, মাতৃভাষা। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালির মাতৃভাষা বাংলা। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ আর তাদের দোসররা কৌশল করল বাঙালির মুখের ভাষা বাংলাকেই ওরা খতম করে দেবে। ১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান নামে নতুন রাষ্ট্র হলো তখনি প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে? রাষ্ট্রভাষা হচ্ছে দেশের প্রধান ভাষা, যে ভাষায় দেশের সব কাজ হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের ওরা বলল, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।

উর্দু পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা হতে পারে। ওই ভাষা রাষ্ট্রভাষা হলে পূর্ব–পাকিস্তানের বাঙালির কী হবে? উর্দু তো তাদের ভাষা নয়, তাদের ভাষা বাংলা। তাছাড়া, বাংলা কত পুরনো ভাষা, কতো ভালো ভাষা। এই ভাষায় হাজার বছর ধরে কতো সাহিত্য কাব্য গল্প গাথা লেখা হয়েছে। বাঙালির ঘুম পাড়ানো-- ঘুম ভাঙানো গান এই ভাষায়। মায়ের কোলে বাঙালি শিশু কোন্ ভাষায় প্রথম কথা বলে, মায়ের মুখে তারা কোন্ ভাষা শোনে? সে বাংলা ভাষা। তারপর লেখাপড়া? লেখাপড়া কি নিজের ভাষা বাদ দিয়ে অন্য ভাষায় ভালো হয়? আমার ভাষায় আমি সব কাজকর্ম করতে পারব না এ কেমন কথা? কবি বলেছেন : ‘মোদের গরব মোদের আশা, আ’ মরি বাংলাভাষা !’ সেই ভাষাকেই ওরা খতম করতে চায়?

সারা পাকিস্তানের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থাৎ বাংলা ভাষাভাষীর লোকসংখ্যাই কিন্তু ছিল বেশি, ৫৬ শতাংশ। আর পশ্চিম পাকিস্তানের সব মানুষের ভাষা যে উর্দু তাও নয়। সেখানে সিন্ধুর ভাষা সিন্ধি, পাঞ্জাবের ভাষা পাঞ্জাবি, বেলুচিস্তানের ভাষা বেলুচি, সীমান্ত প্রদেশের ভাষা পশ্‌তু। অথচ বাঙালির ভাষা রাষ্ট্রভাষা হবে না। উর্দু যাদের ভাষা তারা চাকরি–বাকরিতে কত সুযোগ–সুবিধা পাবে। সেইসব সুযোগ–সুবিধা পেতে হলে বাঙালিকে শিখতে হবে উর্দু ভাষা। বাঙালি বুঝল তাদের কী সর্বনাশ হতে চলেছে। তারা প্রতিবাদ করে উঠল। গড়ে উঠল আন্দোলন। এই আন্দোলন ভাষা–আন্দোলন নামে বিখ্যাত।

তখন তো নতুন দেশ পাকিস্তান। নতুন আশা, নতুন উৎসাহ। তাছাড়া, ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতার বাতাবরণ

সৃষ্টি করা হয়েছিল। তাই প্রথম প্রথম সবাই বুঝতে পারে নি বাংলা রাষ্ট্রভাষা না হলে বাঙালির কী ক্ষতি হবে। কিন্তু কিছু লোক ও সংগঠন ঠিকই বুঝেছিল।

যখন বলা হলো উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, তখন সেই ১৯৪৭ সালেই গণ আজাদী লীগ বাংলার দাবি তুলে ধরেছিলেন। তখন দৈনিক 'আজাদ' প্রকাশিত হতো কলকাতা থেকে। এই কাগজে আবদুল হক, মাহবুব জামাল জাহেদী, ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং আরো অনেকে প্রবন্ধ লিখে দেখালেন উর্দুর চেয়ে বাংলার দাবি কম তো নয়, বরং বেশি।

তমদ্দুন মজলিস এবং এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবুল কাসেম এই সময় এগিয়ে আসেন। তাঁরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য প্রচার করতে থাকেন, বাঙালিদের মধ্যেও যাঁরা এই প্রশ্নের গুরুত্ব বুঝতেন না, এমনকি এমন বাঙালিও ছিলেন যাঁরা মনে করতেন উর্দুরই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত, তাঁদের বোঝাতে থাকেন। নভেম্বর মাসে আবুল কাসেম ও অন্যেরা পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি দিলেন। এতে শত শত ব্যক্তি স্বাক্ষর করেন। কিন্তু সরকার এতে কান দিলেন না। ঢাকায় খবর এল যে, করাচিতে পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের প্রদেশগুলির শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব নেয়া হয়েছে। ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। ৬ই ডিসেম্বর (১৯৪৭) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র-সভা অনুষ্ঠিত হলো। রাষ্ট্রভাষার দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই প্রথম সভা। এতে সভাপতিত্ব করেন আবুল কাসেম। যাঁরা বক্তৃতা করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মুনীর চৌধুরী, আবদুর রহমান, কল্যাণ দাশগুপ্ত, এ. কে. এম. আহসান, এস. আহমদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ফরিদ আহমদ যে প্রস্তাবগুলি পেশ করেন তাতে স্পষ্টভাবে দাবি করা হয়, বাংলাকে পাকিস্তান ডমিনিয়নের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ভাষা ও শিক্ষার বাহন করতে হবে। সভা শেষে ছাত্ররা মিছিল করে শিক্ষা মন্ত্রীকে ঘেরাও করল।

১৯৪৭ সালেই এইভাবে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল। ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলো। এর আহ্বায়ক নিযুক্ত হন নূরুল হক ভূঁইয়া। সদস্য ছিলেন আবুল কাসেম, মোহাম্মদ তোয়াহা, নঈমুদ্দীন আহমেদ, শওকত আলী, ফরিদ আহমদ, শামসুল আলম, আবুল খায়ের, আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী, অলি আহাদ এবং আরো কেউ কেউ। এই আন্দোলন গড়ে তুলেছিল প্রধানত ছাত্ররা, বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। আন্দোলনের উপর বিরোধীপক্ষ হামলাও করেছিল।

তারপর এল ১৯৪৮ সাল। একটা ঘটনা ঘটে। ফেব্রুয়ারি মাসে করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশন হয়। তাতে প্রস্তাব করা হয় যে, পরিষদের কাজ চলবে, সদস্যরা পরিষদে বক্তৃতা করতে পারবেন ইংরেজিতে আর উর্দুতে। পূর্ব পাকিস্তানের কংগ্রেস দলের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বললেন, না, বাংলাকেও গণপরিষদের কাজের ভাষা করতে হবে। কিন্তু তাঁর কথা শোনা হলো না। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আর পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন বিরোধিতা করলেন। তাঁরা বলতে চাইলেন ইসলামি রাষ্ট্রে পাকিস্তানের উর্দু রাষ্ট্রভাষা হবে এটাই স্বাভাবিক। খাজা নাজিমুদ্দিন একটা ডাহা মিথ্যা বললেন, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষারূপে পেতে চায়। এই খবর ঢাকায় এসে পৌঁছালে যেন আগুনে ঘি পড়ল। ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকরা ভয়ানক প্রতিবাদ করলেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা ধর্মঘট করল, বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সভা হলো, সভাপতিত্ব করেন আবুল কাসেম। নঈমুদ্দীন আহমেদ, মোহাম্মদ তোয়াহা তীব্র বক্তৃতা করেন। কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করে খাজা নাজিমুদ্দিনের নিন্দা করা হয় ও ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে অভিনন্দন জানানো হয়। 'আজাদ' পত্রিকা লিখল, এ বাংলাভাষার অপমান। নতুন করে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলো ২রা মার্চ। এই পরিষদে বিভিন্ন সংগঠনের দু'জন করে প্রতিনিধি গৃহীত হন। আহ্বায়ক মনোনীত হন শামসুল আলম।

তারপর ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাসে একটা দিন বিখ্যাত হয়ে রইল। সে দিনটি ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ। ওই দিন সাধারণ ধর্মঘট হলো। ঢাকা শহরে তোলপাড় চলল। প্রধানত ছাত্ররাই বিক্ষোভ সংগঠিত করল, তাতে যোগ দিল অফিস-আদালতের কর্মচারী, রেল-শ্রমিক। সেদিন ঢাকায় মফস্বল থেকে ছাত্ররা এসেছিল মাতৃভাষার দাবির প্রতি সমর্থন জানাতে। শহরের রাজপথগুলো বিক্ষোভে মিছিলে আর 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগানে কেঁপে উঠল। তার উপর আক্রমণ নেমে এল। সেক্রেটারিয়েট ঘেরাও করা হলো। একদিকে পুলিশের বেটন বেয়নেট বুট চলল, অন্যদিকে মুসলিম লীগের কিছু নেতার গুণ্ডারা ঝাঁপিয়ে পড়ল। বহু ছাত্র আহত হলো, জ্ঞান হারিয়ে হাসপাতালে গেল। কয়েকশ' গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেলেন। তাঁদের ক'জনের আর নাম বলা যায়। তাঁদের মধ্যে পরবর্তীকালে বিখ্যাত নেতা হয়েছিলেন এমন কয়েকজনের নাম বলি। তাঁরা হলেন শওকত আলী, কাজী গোলাম মাহবুব, শামসুল হক, অলি আহাদ, আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী, আবদুল মতিন, আবদুল মালেক উকিল, গোলাম আযম, শেখ মুজিবুর রহমান। মোহাম্মদ তোয়াহা আহত হয়ে হাসপাতালে যান।

জুলুমের প্রতিবাদে ছাত্র-ধর্মঘট ও সাধারণ ধর্মঘট চলে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত। মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন বিক্ষোভের এই রুদ্রমূর্তি দেখে ভয় পেয়ে আপোসের জন্য সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়। যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ছেড়ে দেয়া হয়। বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের ভাষারূপে তিনি মেনে নেন। কিন্তু একটা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। পাকিস্তান সরকারের কাছে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানাবেন বলে তিনি কথা দিয়েছিলেন। তার খেলাপ করেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির প্রধান নেতা এবং গভর্নর-জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (যাঁকে বলা হতো কায়েদে-আজম এবং জাতির পিতা) ১৯শে মার্চ ঢাকা এসেছিলেন। তিনি বাঙালির দাবি, তাদের মনের কথা বুঝতে পারলেন না।

বললেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ছাত্ররা তাঁর মুখের উপরেই প্রতিবাদ করে বলল, না না, তা হতে পারে না।

ফল কি হলো? ঘটল ১৯৫২ সালের ঘটনা।

এর মধ্যে জিন্নাহ্ সাহেব মারা গেলেন, প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে গুলি করে মেরে ফেলা হলো। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন খাজা নাজিমুদ্দিন। তাঁর জায়গায় পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হলেন মুসলিম লীগের নুরুল আমিন। এই মুসলিম লীগ সংগ্রাম করে পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু মুসলিম লীগ সরকার তো দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারল না। বরং মানুষের ন্যায্য দাবিকে তারা গায়ের জোরে নস্যাৎ করে দিতে লাগল। পূর্ব বাংলায় ভয়ানক অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিল। সোনার বাংলাকে শোষণ করে অর্থ-সম্পদ নিয়ে যেতে লাগল পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব বাংলার সোনার আঁশ পাট কৃষকের কাছ থেকে অল্প দামে কিনে পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসায়ীরা কোটিপতি হতে লাগল। পাকিস্তান সরকার কেন্দ্রীয় বাজেটের বেশির ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নের কাজে ব্যয় করতে লাগলো, পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্যে জুটল সামান্য। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি পেল সামান্য। পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা-ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার মতো অবস্থা হলো। ঘন-ঘন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এমনকি ওরা বলতে লাগল, পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমান, মুসলমান হিসাবে নিকৃষ্ট। দুঃখের কথা, পূর্ব পাকিস্তানের অনেক বাঙালি নেতা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে থাকল। তাই মওলানা ভাসানী আতাউর রহমান খান, শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান এবং আরো কত কত নেতা, কর্মী মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে গিয়ে নতুন বিরোধী পার্টি গঠন করলেন আওয়ামী লীগ।

আবার একটা ঘটনা ঘটল। প্রধানমন্ত্রী ও মুসলিম লীগের সভাপতি খাজা নাজিমুদ্দিন ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি

করাচি থেকে ঢাকা এলেন। পল্টন ময়দানের সভায় দাঁড়িয়ে আবার বললেন সেই পুরনো কথা। বললেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। সঙ্গে সঙ্গে আবার আগুন জ্বলে উঠল। আবার বিক্ষোভ সভা সমাবেশ মিছিল। আবার ছাত্ররা এগিয়ে এল, শ্লোগান তুলল, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।' ৩০শে জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট হলো।

সবাই বুঝলেন এবার আরো বড় আন্দোলন করতে হবে। জোট বাঁধতে হবে। ছাত্র-নেতা আর বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দলের নেতাদের সভা হলো ৩১শে জানুয়ারি। এতে সভাপতিত্ব করলেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানী। আবার ভালো করে গঠিত হলো 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ'। কর্মপরিষদে প্রতিনিধি নেয়া হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দল, ছাত্র-সংগঠন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-হল থেকে, আরো থাকেন পূর্ববঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য, ছাত্রনেতা ইত্যাদি। কর্মপরিষদে ৪০-৪২ জন প্রতিনিধি ছিলেন বলে জানা যায়, কিন্তু সব নাম আজ আর পাওয়া যায় না, নিচের এই ২৮টি নাম পাওয়া যায় : মওলানা ভাসানী, আবুল হাশিম, শামসুল হক, আবদুল গফুর, আবুল কাসেম, আতাউর রহমান খান, কামরুদ্দিন আহমদ, খয়রাত হোসেন, আনোয়ারা খাতুন, আলমাস আলী, আবদুল আওয়াল, সৈয়দ আবদুর রহিম, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি-আহাদ, শামসুল হক চৌধুরী, খালেক নেওয়াজ খান, কাজী গোলাম মাহবুব, মীর্জা গোলাম হাফিজ, মুজিবুল হক, হেদায়েত হোসেন চৌধুরী, শামসুল আলম, আনোয়ারুল হক খান, গোলাম মাওলা, সৈয়দ নূরুল আলম, নুরুল হুদা, শওকত আলী, আবদুল মতিন, আখতার উদ্দিন আহমদ। কর্মপরিষদের আহ্বায়ক নিযুক্ত হন কাজী গোলাম মাহবুব।

কর্মপরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সারা পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল, সভা ও বিক্ষোভ মিছিল হবে। তখন বাঙালির দাবি হচ্ছে উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হোক, কিন্তু তার সঙ্গে বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। ১৯৫২ সালের

ভাষা-আন্দোলনে আর একটা দাবিও করা হয়েছিল। মুসলিম লীগ সরকার তখন আর একটা চক্রান্ত চালাচ্ছিলেন। বাংলাভাষা আরবি হরফে লেখা হোক এই চেষ্টা করা হচ্ছিল। এর বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করা হচ্ছিল ভাষা-আন্দোলনে।

২১শে ফেব্রুয়ারির প্রস্তুতি চলল। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র-ধর্মঘট হলো, বিরাট বিরাট মিছিল হচ্ছে, দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার লাগানো হচ্ছে। তাতে বলা হচ্ছে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। তাতে নাজিমুদ্দিন সাহেবের ব্যঙ্গচিত্রও থাকছে। ১১, ১২ আর ১৩ই ফেব্রুয়ারি পতাকা দিবস পালন করা হলো, অর্থাৎ ছোট ছোট পতাকা বিক্রি করে আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হলো আর উদ্দীপনা সৃষ্টি করা হলো।

তারপর এলো ইতিহাসের সেই বিখ্যাত দিন ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি, সেই করুণ-কঠিন দিন।

মুসলিম লীগের নুরুল আমিন সরকার কী করলেন, ভয় দেখাবার জন্য, আন্দোলন স্তব্ধ করার জন্য আগের দিন ১৪৪ ধারা জারি করে দিলেন। ওই আইন জারি করলে একসঙ্গে চারজনের বেশি রাস্তায় নামা যায় না, সভা-সমাবেশ-মিছিল করা যায় না। ওই আইন ভাঙ্গলে জেল, জরিমানা হতে পারে।

২০শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সভা বসল কী করা যায়? একদল বললেন, আমরা আইন মানব না, ১৪৪ ধারা ভাঙ্গব। আর একদল বললেন, না, সেটা ঠিক হবে না। আন্দোলন তো চালাচ্ছে প্রধানত ছাত্ররা। তারা স্থির করল ১৪৪ ধারা ভাঙ্গবে।

২০ তারিখের কর্মপরিষদের সভায় যে ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার পক্ষে বেশির ভাগ মত দেখা দিয়েছিল তার একটা কারণ ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোতে ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচন ঠিকই হয়েছে, কিন্তু মুসলিম লীগ সরকার পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপরিষদের নির্বাচন কিছুতেই করছিলেন না, কারণ ততদিনে জনসাধারণের মধ্যে তাঁদের সমর্থন পড়ে গিয়েছিল। ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে আইন অমান্য করা হলে যে পরিস্থিতি

দেখা দেবে তাতে সরকার নির্বাচন না করার আরো অজুহাত পেয়ে যাবে। যাই হোক, ছাত্র-নেতারা সিদ্ধান্ত নিলেন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হবে, আন্দোলন দমন করার সব চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেয়া হবে।

এল ২১শে ফেব্রুয়ারি। ইতিহাসে রক্তের অক্ষরে লেখা জ্বলন্ত দিন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্ররা সভা করল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তখন ছিল আজকের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের একটা অংশে। তুমুল উত্তেজনা, কোলাহল, তর্কাতর্কি। আওয়ামী লীগের শামসুল হক এসে বক্তৃতা করলেন, বোঝাতে চাইলেন কেন ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা ঠিক হবে না। উপাচার্য সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন ও কয়েকজন অধ্যাপক এসে ছাত্রদের অনুরোধ করলেন, তোমরা ১৪৪ ধারা ভেঙো না। কিন্তু আবদুল মতিন, গাজীউল হক এঁদের বক্তৃতায় দ্বিধা, ভয় কোথায় চলে গেল। ততক্ষণে বেলা দুপুর হয়েছে। ফাল্গুনের মিষ্টি সকাল রোদে ধুলোয় উত্তেজনায় তেতে উঠেছে। ওদিকে গেটের বাইরে রাস্তায়, বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে সশস্ত্র সব পুলিশ প্রস্তুত হয়ে আছে।

গর্জে উঠলো শ্লোগান, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। তারপর ছাত্ররা কোমর বাঁধল। পাঁচজন সাতজন দশজন করে ছোট-ছোট দলে গেট পেরিয়ে রাস্তায় নেমে ১৪৪-ধারা অমান্য করতে লাগল। মুখে শ্লোগান 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। পুলিশ তাদের ধরে গাড়িতে তুলে থানায় নিয়ে যেতে লাগল। কে আগে যাবে এই নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। পুলিশ হিমসিম খেয়ে গেল। কত আর তারা গ্রেপ্তার করবে, থানায় আর কত জায়গা হবে। সত্যাগ্রহীদের অনেককে গাড়িতে তুলে ঢাকার বাইরে দূরে ছেড়ে দিয়ে আসতে লাগল। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে তখন আইন-অমান্যকারী সত্যাগ্রহীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ লাঠি চালাল। লাঠির ঘায়ে পথে লুটিয়ে পড়তে লাগল ছাত্ররা। মেয়েদের দল পাঠানো হতে লাগলো, যাতে পুলিশ থমকে যায়, তাদের মনে দয়া হয়। কিন্তু মেয়েদের মাথায়ও পড়ল লাঠি। পুলিশ তখন কাঁদানে-গ্যাসের শেল ছাড়ল, কেবল পথে নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে। মানুষ আর কতক্ষণ সহ্য করে, বিশেষ করে ছাত্ররা! পুলিশের উপর ইট-পাটকেল

ছুঁড়তে লাগল। চলল পুলিশের সঙ্গে ছাত্র-জনতার খণ্ডযুদ্ধ। ছাত্রদের সঙ্গে বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিল এলাকার রেস্টুরেন্টের বয়, অফিসের পিয়ন-কর্মচারী, রিকশাওয়ালারা। পুলিশ তাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না। তখন ঘটল সেই মর্মান্তিক ঘটনা। পুলিশ গুলি চালাল। কেবল রাস্তায় নয়, মেডিক্যাল কলেজের ভিতরে। পথের উপরেই শহীদ হলেন মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজের আই. কম.-এর ছাত্র রফিকউদ্দীন আহমদ। রফিকের মাথার খুলি উঠে গিয়েছিল, মগজ বেরিয়ে পড়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ.-এর ছাত্র আবুল বরকত শহীদ হন মেডিক্যাল কলেজের ভিতরে। অসংখ্য আহত হয়ে হাসপাতালের শয্যায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়তে লাগলেন। ডাক্তার-নার্সরা অক্লান্তভাবে তাঁদের চিকিৎসা অপারেশন সেবা করে চললেন। আহতদের মধ্যে পূর্ববঙ্গ সরকারের শিল্প দপ্তরের পিয়ন আবদুস সালাম পরে মারা যান। অহিউল্লাহ নামে আট-নয় বছরের এক কিশোরও শহীদ হন। মেডিক্যাল কলেজ-- বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঘটনার খবর আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। সোনার ছেলেরা মাতৃভাষা বাংলার মান রাখতে প্রাণ দিয়েছেন এই খবর শুনে সবাই শোকে দুঃখে রাগে ঘৃণায় অস্থির হয়ে উঠল। মানুষের স্রোত ছুটে এল মেডিক্যাল কলেজের দিকে। তারা আহতদের খবর নিতে লাগল, তাঁদের প্রাণরক্ষার জন্য ছাত্রদের আবেদনে সাড়া দিয়ে রক্ত দিতে লাগল। আর সবকিছু বন্ধ হয়ে গেল। ক'দিন যেন আর সরকারই রইল না। ছাত্ররা মাইকে অনলবর্ষী ভাষায় বক্তৃতা করছে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল, এস. এম. হল থেকে। ক'দিন তারা যা বলেছে, যা নির্দেশ দিয়েছে লোকে তাই শুনেছে। যেমন তারাই সরকার। সবাই ধিক্কার দিচ্ছে নুরুল আমিনকে আর তার মুসলিম লীগ সরকারকে।

পরদিন ২২শে ফেব্রুয়ারিও গুলি চলল। ঐ দিন মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে শহীদদের লাশের জানাজার নামাজ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু একটি লাশও পাওয়া গেল না। পূর্বরাত্রে পুলিশ মর্গ থেকে লাশ সরিয়ে গায়েব করে দিয়েছে। তাই গায়েবানা জানাজা নামাজ হলো। মর্মস্পর্শী ভাষায় ইমাম

সাহেব মোনাজাত করলেন, হে আল্লাহ্, যে জালেমরা আমাদের মাসুম বাচ্চাদের উপর গুলি চালিয়েছে তাদের ধ্বংস করে দাও।

গায়েবানা জানাজার পর লক্ষ লোকের শোক মিছিল বেরিয়েছিল। মিছিলে উড়ছে শহীদদের রক্তমাখা জামা। এই মিছিলেন উপর আবার শহরের নানা জায়গায় গুলি চলল, এমনকি বেয়নেট চার্জ করা হয়েছিল। এদিন শহীদ হলেন শফিউর রহমান। আরো কত সংগ্রামী শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ তাঁদের লাশ গুম করে ফেলে। অবশ্য রাতের আঁধারে গোপনে পুলিশ আজিমপুর পুরাতন গোরস্তানে কয়েকজন শহীদের লাশ কবর দিয়েছিল। তাঁদের মধ্যে এখন কেবল শহীদ আবুল বরকত আর শহীদ শফিউর রহমানের কবর দু'টি রয়েছে।

ওদিকে ২১শে আর ২২শে ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের অভ্যন্তরে চলল তুমুল আলোচনা বিতর্ক বিক্ষোভ। সদস্যরা ছাত্রহত্যার তদন্ত আর অপরাধীদের বিচার দাবি করলেন, নুরুল আমিনের পদত্যাগ দাবি করলেন। সেই স্মরণীয় বিতর্কে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং বাংলাভাষার দাবি তুলেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মনোরঞ্জন ধর, মওলানা তর্কবাগীশ, গোবিন্দলাল ব্যানার্জি, বসন্তকুমার দাস, শামসুদ্দিন আহমদ, শামসুদ্দিন আহমদ খোন্দকার, ভোলানাথ বিশ্বাস, খয়রাত হোসেন, আলী আহমেদ খান, আনোয়ারা খাতুন, প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী, বিনোদচন্দ্র চক্রবর্তী, মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মওলানা তর্কবাগীশ এবং পরে আরো কেউ কেউ ছাত্রদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে পরিষদ থেকে পদত্যাগ করলেন।

প্রতিবাদের যে ঝড় বয়ে চলল তাতে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করল অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা ; যেমন, দৈনিক আজাদ, সাপ্তাহিক ইত্তেফাক, সাপ্তাহিক সৈনিক, দৈনিক ইনসাফ, সাপ্তাহিক নও-বেলাল ইত্যাদি। দৈনিক মর্নিং নিউজ ভাষা-আন্দোলনের বিরোধী ভূমিকা পালন করায় জনগণ তার অফিসে আগুন ধরিয়ে দেয়।

আন্দোলন চলল। চলল লাগাতার হরতাল আর বিক্ষোভ, কেবল ঢাকা শহরে নয়, সারা পূর্ব পাকিস্তানে, সমস্ত শহরে, এমনকি বহু গ্রাম পর্যন্ত তা ছড়িয়ে পড়েছিল। ঢাকায় কারফিউ জারি হলো। নেতারা ছাত্রদের কাছে এসে একাত্মতা ঘোষণা করলেন। আবুল বরকত যেখানে শহীদ হয়েছিলেন সেই জায়গায় ছাত্ররা ২৩শে ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত্রে কারফিউয়ের মধ্যে এক রাত্রে বেশ উঁচু এক শহীদ মিনার গড়ে তোলেন। যত মানুষ, নারীপুরুষ এসে সেখানে অশ্রু ফেলে, টাকা-পয়সা দেয়, এমনকি কোনো কোনো মেয়ে গায়ের অলঙ্কার রেখে যায়। কিন্তু পুলিশ এসে একদিন শহীদ মিনার ভেঙে দিয়ে যায়। কবি লেখেন :

স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার?
ভয় কি বন্ধু,
আমরা রয়েছি চার কোটি পরিবার।....

তারপর আরো জেল-জুলুম নেমে আসে। ভাষা-আন্দোলনের নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। অনেকে আত্মগোপন করেন।

কিন্তু তাতে কী লাভ হলো? মানুষের বিক্ষোভ, সংগ্রাম আর অধিকার কি ওরা দমন করতে পারল? পূর্ব পাকিস্তানে সেই নির্বাচন হলো ১৯৫৪ সালে। তাতে মুসলিম লীগ হেরে একেবারে প্রায় শেষ হয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন এক তরুণ ছাত্র নেতার কাছে হেরে গেলেন। ভাষা-আন্দোলন চলেছিল ১৯৫৬ পর্যন্ত। ওই বছর পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বলে স্বীকার করতে হলো। কেবল তাই নয়, সেই যে বাঙালি জাতীয়তার চেতনা মাথা তুলল, তাই ক্রমে ক্রমে ১৯৭১ সালে গিয়ে পাকিস্তানি শাসক-শোষকদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াইয়ের, মুক্তিযুদ্ধের রূপ নিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। তাই আমরা এখনো গাই :

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি?

আমাদের ভাষা-আন্দোলনের শিক্ষা হলো : সকল ভাষার সমান মর্যাদা। আর মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে কখনো শাসন-ত্রাসন দিয়ে দমন করা যায় না।

বশীর আল্‌হেলাল

শহীদ আবুল বরকত : জীবন-কথা

আবুল বরকত শহীদ হন ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২। আনুষঙ্গিক ঘটনাসহ, যতদূর পারা যায়, তাঁর শহীদ হওয়ার বিবরণ ও তাঁর পরিচয় দেয়া হলো।

সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ২১শে ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ হরতাল, সভা ও বিক্ষোভ মিছিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু মুসলিম লীগের নুরুল আমিন সরকার ২০শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে ১৪৪-ধারা জারি করে সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ করে দেন। ছাত্ররা স্থির করে তারা আইন অমান্য করবে, ১৪৪ ধারা ভাঙ্গবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তখন বর্তমান মেডিক্যাল কলেজের এক অংশে ছিল) সভা করে ছাত্ররা পাঁচ সাত দশজনের ছোট ছোট দলে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিতে দিতে গেট পেরিয়ে রাস্তায় নেমে ১৪৪-ধারা ভেঙ্গে সত্যাগ্রহ শুরু করলে তাদের পুলিশ গ্রেপ্তার করতে থাকে। তারপর পুলিশ লাঠি চালায়, কাঁদানে গ্যাস ছাড়ে। পুলিশের সঙ্গে ছাত্র-জনতার খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়। ছাত্ররা ইট-পাটকেল ছুঁড়তে। সেদিন ছিল পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন। বিক্ষোভ-মিছিল যাতে পরিষদ ভবনের দিকে যেতে না পারে তার জন্য পুলিশ, ইপিআর ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছিল। ছাত্র-জনতার মিছিল মেডিক্যাল হোস্টেল থেকে বেরিয়ে বারবার ব্যারিকেড ডিঙিয়ে পুলিশি জুলুমের প্রতিবাদ আর বাংলাভাষার দাবি পেশ করার জন্য পরিষদ-ভবনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছিল।

তখন বেলা ৩টার মতো হবে। ছাত্র-জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ তীব্র হয়ে ওঠে। পুলিশ এঁটে উঠতে পারে না। তাদের একবার পিছুও হটে যেতে হয়। তখন তারা হঠাৎ কোনো সতর্কতা উচ্চারণ না করে গুলি শুরু করে। গুলি চালিয়েছিল রাস্তায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে, মেডিক্যাল কলেজের ভিতরে। গুলি খেয়ে কে যে প্রথম শহীদ হয়েছিলেন আজ

আর নিশ্চয় করে বলা যায় না। তবে মানিকগঞ্জের দেবেন্দ্র কলেজের আই. কম.-এর ছাত্র উনিশ কুড়ি বছরের তরুণ রফিক উদ্দীন আহমদ প্রথম শহীদ হন। তাঁর লাশ ছাত্ররা ধরাধরি করে মেডিক্যাল কলেজের ভিতরে নিয়ে যায়।

তখন মেডিক্যাল কলেজের ভিতরে ছাত্রদের হোস্টেল ছিল ছাপড়ার তৈরি কতকগুলি ব্যারাকের মতো ঘরের। ২০ নম্বর ব্যারাকের বারান্দায় ঘটল ঘটনাটা। পুলিশ হোস্টেলের গেট ঘেরাও করে দাঁড়িয়েছে। পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ চলছে। ছাত্ররা গিয়ে ব্যারাকগুলির ভিতরে বারান্দায় কেউ আত্মরক্ষা করতে কেউ প্রতিরোধ করতে জমা হয়েছে। পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুঁড়ছে। চোখের জ্বালা থেকে বাঁচার জন্য হাঁড়ি-কলসিতে পানি এনে রাখা হয়েছে, তাতে রুমাল ভিজিয়ে নিয়ে চোখে দেয়া হচ্ছে। ছাত্ররা রয়েছে কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, প্রকৌশল ইত্যাদির। ছাত্ররা আর বয় বাবুর্চিরা ইট ভেঙে জমা করে রেখেছে, যাতে পুলিশ ভিতরে ঢুকতে না পারে। ব্যারাকে এসে কাঁদানে গ্যাসের শেল পড়ছিল। কেউ কেউ আবার শেল ফাটবার আগেই তুলে নিয়ে পুলিশের দিকে ছুঁড়ে মারছিল। ঘণ্টা দু'তিন ধরে এই চলছিল। হোস্টেল প্রাঙ্গণে অনেক ছাত্র। বুলেট আর ইটের লড়াই চলছে। কারো চোখে ভয় নেই, আছে ঘৃণা আর উন্মাদনা। আর শ্লোগান আর শ্লোগান : 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। ছাত্ররা লড়ছে ইট পাটকেল দিয়ে, পুলিশকে কিছুতে হোস্টেল চত্বরে আসতে দেয়া হবে না। তারা প্রতিরোধ ভাঙার চেষ্টা করছে বারবার, ব্যর্থ হচ্ছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম. এ.-র ছাত্র আবুল বরকত এক বন্ধুকে দেখে এগিয়ে এলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেলেন। পুলিশ ঢুকে সোজা গুলি চালিয়েছে। প্রথমে কেউ বুঝতেই পারে না কী হয়েছে। ততক্ষণে রক্ত ঝরতে শুরু করেছে। তলপেটে লেগেছে গুলি। গায়ে ছিল নীলরঙের হাফ-শার্ট, পরনে খাকি প্যান্ট, পায়ে কাবুলি স্যান্ডেল। একজন আহত আবুল বরকতের দুই ঠ্যাং কাঁধে তুলে নিলেন, একজন মাথা নিলেন তাঁর কাঁধে। দৌড়াতে লাগলেন তাঁরা তাঁর লম্বা সুঠাম দেহটা নিয়ে। নিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছিল। তাঁর কোমর ঝুলে গেছে, সেখান থেকে টপটপ করে রক্ত ঝরছে। পানি চাইলেন, কিন্তু

কোথায় পানি। পুলিশ দেখলে কেড়ে নিতে পারে, তাই পড়িমরি তাঁরা ছুটছেন। ভেজা রুমালটা তাঁকে চুষতে দেয়া হলো। তখন দু–তিনজন এগিয়ে এলেন সাহায্য করতে। একজন তাঁর কোমরে কাঁধ দিলেন। বরকত বললেন, 'খুব কষ্ট হচ্ছে। বাঁচব না। বিষ্ণুপ্রিয়া ভবন, পুরানা পল্টনে খবর পৌঁছে দেবেন।' তাঁকে নিয়ে এমার্জেন্সি ওসার্ডে নামা হলো। কেউ কেউ কেঁদে ফেললেন। একজন নার্স 'কাপুরুষ বলে গালাগালি দিয়ে প্রতিশোধ নেবার জন্য আবার গেটে যেতে বললেন। তখনি স্ট্রেচারে করে একজনের মৃতদেহ আনতে দেখা গেল। তাঁর মাথার খুলি উড়ে গেছে। নিচের দিকে খানিকটা ঘিলু ঝুলছে। শুধু দাঁতগুলি দিয়ে যেমন হাসছে সবার দিকে তাকিয়ে।

আবুল বরকত মারা যান রাত আটটার দিকে। ডাক্তাররা তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রক্তক্ষরণ বন্ধ করা যায় নি।

২১শে ফেব্রুয়ারি মোট কতজন শহীদ হয়েছিলেন আজ আর বলা যায় না। রাস্তায় আর বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের লাশ পুলিশ সেখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল বলে শোনা যায়। শহীদদের অনেকের লাশ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। এইসব লাশের পরদিন জানাজার নামাজ পড়া হবে ও লাশ নিয়ে মিছিল করা হবে বলে ছাত্ররা মাইকে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু লাশ পাওয়া যায় নি। পুলিশ রাতেই লাশ মর্গ থেকে সরিয়ে ফেলেছিল। শহীদদের গায়েবানা জানাজার নামাজ পড়া হয়েছিল পরদিন এবং তাঁদের রক্তমাখা জামাকাপড় নিয়ে মিছিল করা হয়েছিল।

কিন্তু আবুল বরকতের এক আত্মীয় ছিলেন এস. এম. জি. বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি, এ. কাসেম, তাঁর মামা ছিলেন আবদুল মালেক, পানি–উন্নয়ন বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টস অফিসার। তাঁরা তদ্‌বির করে পুলিশের কাছ থেকে লাশ উদ্ধার করেন। তাঁরা কথা দেন রাতের মধ্যেই লাশ দাফন করবেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি রাত ১০টার দিকে আবুল বরকতের লাশ হাসপাতাল থেকে কড়া পুলিশ

পাহারায় আজিমপুর পুরাতন গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। বরকতের মামা মালেক সাহেব পরিবারের পক্ষ থেকে কবরের জায়গা কেনার টাকা এবং কাফনের খরচ দেন। আজিমপুরা মসজিদের ইমাম হাফেজ মোহাম্মদ আবদুল গফুর তাঁর জানাজার নামাজ পড়ান। তাঁর উক্ত দুই আত্মীয় ছাড়া কিছু মহিলা আত্মীয়াও উপস্থিত ছিলেন। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ ইউসুফও উপস্থিত ছিলেন। কবর দিয়ে যখন সবাই বাড়ি ফেরেন তখন ভোর হয়ে গেছে।

আবুল বরকতের কবর তাঁর পরিবার থেকেই পাকা করে দেয়া হয়েছিল। ১৯৭১-এর পর বাংলাদেশ সরকার শুধু বালি-সিমেন্ট দিয়ে রক্ত লাল রঙে কবরটিকে নতুন করে বাঁধিয়ে দেন। ভাষা-আন্দোলনের অন্য শহীদ (২২শে ফেব্রুয়ারি নিহত) শফিউর রহমানের কবরটিও বরকতের কবরের কাছাকাছি রয়েছে। সেটিকেও একই রকম করে সরকার বাঁধিয়ে দিয়েছেন। কবর দু'টিকে আর একটু ভালো করে বাঁধানো কর্তব্য ছিল। প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি অসংখ্য মানুষ এই কবর দু'টিতে গিয়ে ফুল দেন। ভাষা-আন্দোলনের স্মৃতি এবং আবেগ যখন তাজা ছিল তখন মানুষ এই দুই কবরে অশ্রু ফেলত। ভাষা-আন্দোলনের আর কোনো শহীদের কবর এখন নেই।

আবুল বরকতের জন্ম তৎকালীন ভারতের বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার ভরতপুর থানার বাবলা নামক একটি ছোট গ্রামে ১৯২৭ সালের ১৬ই জুন। তাঁর বাবার নাম শামসুজ্জোহা। বাবলার পার্শ্ববর্তী গ্রাম তালিবপুর (বর্তমান নিবন্ধকারের জন্মস্থান)। তালিবপুর হাই ইংলিশ স্কুল থেকে তিনি ১৯৪৫ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে ১৯৪৭ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি পূর্ব বাংলায় চলে আসেন এবং ঢাকায় তাঁর উক্ত মামা মালেক সাহেবের বাড়িতে পুরানা পল্টন লাইনের 'বিষ্ণুপ্রিয়া ভবনে' মৃত্যুর দিন পর্যন্ত থাকেন। ১৯৪৮ সালেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অনার্সে ভর্তি হন। তিনি অত্যন্ত মনোযোগী ছাত্র ভদ্র, নম্র, বিনয়ী, চরিত্রবান ছিলেন।

১৯৫১ সালে তিনি অনার্স পরীক্ষায় ২য় শ্রেণীতে ৪র্থ স্থান পান।

২৫শে মার্চ, ১৯৫২ শহীদ আবুল বরকতের ছোটভাই আবুল হাসনাত ঢাকা সদর মহকুমা হাকিম এন. আহমদের এজলাসে একটা মামলা দায়ের করার চেষ্টা করেন। আবুল বরকতকে গুলি করে হত্যা করার অপরাধের জন্য তিনি ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোরেশী, সিটি এস. পি মাসুদ মাহমুদ, ডি. আই. জি . এ. জেড ওবায়দুল্লা ও জন কয়েক পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। আবেদনে বলা হয় : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য় বর্ষ এম. এ. ক্লাশের ছাত্র আবুল বরকত ২১শে ফেব্রুয়ারি অপরাহ্ণে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে তাঁর বন্ধু মোরশেদ নেওয়াজের সঙ্গে দেখা করতে যান। মোরশেদ নেওয়াজ ১২ নং শেডের একটি ঘরে থাকতেন। সেখানে উভয়ের সাক্ষাতের সময় বাইরে নানারূপ শ্লোগান উত্থিত হয়। তাই শুনে বরকত শেডের বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ান এবং কয়েকজন বন্দুকধারী পুলিশকে হোস্টেল এলাকায় প্রবেশ করতে দেখে আবার ঘরে ফিরে যাওয়ার সময় পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে পড়ে যান। কয়েক ব্যক্তি তাঁকে এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে নিয়ে যান। সেখানে ডাঃ নুরুল হক সরকার তাঁর চিকিৎসা করেন। আহত অবস্থায় আবুল বরকত হাসপাতালে কর্তব্যরত মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ও অন্যান্য ব্যক্তির নিকট তাঁর আঘাতের বিবরণ দেন এবং সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে ওই আঘাতের ফলে মারা যান। পুলিশ আবেদনকারীর অনুরোধ সত্ত্বেও মৃতের আত্মীয়–স্বজনের আগমনের অপেক্ষা না করে ও ময়না তদন্ত না করিয়ে ওই রাতেই লাশ দাফন করে।

মহকুমা হাকিম বিচারের জন্য মামলা গ্রহণ করতেই রাজি হন না। তিনি বলেন : অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সকলেই সরকারি অফিসার। ঘটনার পূর্বদিন যে ১৪৪–ধারা জারি করা হয়েছিল তা কার্যকর করার জন্যই তাঁরা ঘটনার সময় কর্তব্যে নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং অভিযোগের বিবরণ অনুযায়ী তাঁরা যা কিছু করেছেন তা নিজ নিজ কর্তব্য হিসাবে করেছেন এবং ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৩৭ ও ১৩২ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের অনুমতি

ছাড়া তাঁদের বিরুদ্ধে বিচারের জন্য কোনো অভিযোগ গ্রহণ করা যায় না।

আবেদনকারী তাঁর অভিযোগের সঙ্গে অনুরূপ কোনো অনুমতিপত্র দাখিল করতে পারেন নি বলে অভিযোগটি খারিজ করে দেয়া হয়।

আবেদনকারীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন আলী আমজাদ খান, আতাউর রহমান খান, এম. রহিম, কামরুদ্দিন আহমদ, জমিরুদ্দিন, জহিরুদ্দিন, নুরুল ইসলাম, সৈয়দ শহিদুল হক ও শামসুল হক। সরকারপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন কোর্ট ইন্সপেক্টর কাজী জহুরুল হক।

২৮শে মার্চ অনুরূপ একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল শহীদ রফিকউদ্দীন আহমদকে গুলি করে হত্যা করার জন্য। সেটারও একই ভাগ্য হয়েছিল।

ভাষা-আন্দোলন চলেছিল, বলা যায়, ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত। পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচন হয় শেষ পর্যন্ত ১৯৫৪ সালে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত ঐতিহাসিক যুক্তফ্রন্ট এই নির্বাচনে মুসলিম লীগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। ২রা এপ্রিল কৃষক-শ্রমিক পার্টির শেরে-বাংলা এ. কে. ফজলুল হক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকার তিন মাসের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে ৯২ (ক) ধারা প্রবর্তন করেন। ইস্কান্দার মীর্জা হন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর। ৩ জুন, ১৯৫৫ ৯২ (ক) ধারার গভর্নরি শাসন প্রত্যাহৃত হয়। কৃষক শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকার আওয়ামী লীগ বর্জিত পাকিস্তানের দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করেন।

১৯৫২ সালের পর প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি শোকদিবস পালিত হতো গভীর আবেগে। তার মধ্যে স্বৈরাচারী গভর্নর শাসনের অধীন উদ্‌যাপিত ১৯৫৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির শোক দিবস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সরকার ২১শে উদ্‌যাপনে বাধা দেন। বহু ছাত্র জেলে যান।

১৯৫৬ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তখন আবার যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছে, আগের বছর এই সরকার যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাংলা একাডেমী স্থাপন করেছেন। অন্য একটি প্রতিশ্রুতি ছিল ভাষা-আন্দোলনের শহীদ মিনার নির্মাণ। তার ভিত্তিপ্রস্তর এবছর স্থাপিত হয়। তাছাড়া, এই ১৯৫৬ সালেই বাংলাভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা স্বীকৃত হয়। পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হলে উর্দুর সঙ্গে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করা হয়। এখানে শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আনুষঙ্গিক ঘটনাসহ দেয়া হলো। উল্লেখ্য যে, মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকারের এই দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সঙ্গে আওয়ামী লীগের সম্পর্ক ছিল তিক্ত নীতিগত কারণে। আওয়ামী লীগ এই সরকারের শরিকও ছিলেন না।

১৯৫৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার ঢাকা ও প্রদেশের সর্বত্র গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে ও যোগ্য মর্যাদার সঙ্গে ভাষা-আন্দোলনের বীর শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এইদিন পূর্বঘোষণা অনুযায়ী, পূর্ববঙ্গ সরকারের তরফ থেকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের ১২ নং শেডের কাছে (যেখানে ১৯৫২ সালে ভাষা-আন্দোলনের অন্যতম শহীদ বরকতকে লীগ সরকারের গুলি আঘাত করেছিল) একটি শহীদ মিনার স্থাপনের ভিত্তিপ্রস্তর প্রথিত করা হয়। পূর্ববঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার, পূর্ববাংলার 'অদ্বিতীয় গণনেতা' মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও শহীদ বরকতের মা একত্রে এই ভিত্তিপ্রস্তর প্রথিত করেন।

শহীদদের অমর আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ওইদিন পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশন ৫ মিনিটকাল স্থগিত রাখা হয়।

ঢাকায় অপরাহ্ণে দু'টি সভা হয়। একটি সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের তরফ থেকে আরমানিটোলা ময়দানে, অন্যটি কৃষক-শ্রমিক পার্টির তরফ থেকে পল্টন

ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। আরমানিটোলা ময়দানে মওলানা ভাসানি এবং পল্টন ময়দানে মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার সভাপতিত্ব করেন। আরমানিটোলা ময়দানের সভাশেষে এক বিরাট মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। এই মিছিলের উপর পথের উভয় পার্শ্বের বাড়ির ছাদ ও বারান্দা থেকে পুষ্পবৃষ্টি করা হয়। পল্টনের সভায় তেমন জনসমাগম হয় নি।

ঘরে ঘরে উড্ডীয়মান কালো পতাকা, শহীদদের সংগ্রাম ও আদর্শের উত্তরাধিকারী ছাত্রছাত্রী ও তরুণ-তরুণীদের বাহুতে সন্নিবিষ্ট কালো ব্যাজ ও নীরবে নগ্নপদে শোকপ্রকাশ, শিক্ষায়তন ও ছাত্রাবাসসমূহের সম্মুখে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, সাশ্রু-নেত্রে দলে দলে নাগরিকদের শহীদ-মাজার জিয়ারত ও শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ এবং পূর্ণ হরতালের মধ্য দিয়ে শোকবিহ্বল মহানগরী ঢাকা ঐতিহাসিক ২১শে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন করে।

প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে শহরে বিষাদের ছায়া নেমে আসে। অতি প্রত্যুষ থেকেই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ছাত্র ও জনতা নগ্নপদে প্রভাতফেরীর গান গাইতে গাইতে মিছিল করে আজিমপুর গোরস্তানে শহীদানের মাজার জিয়ারত করতে যান। বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীগণ এলোচুলে সদ্যস্নাত অবস্থায় নগ্নপদে অশ্রুসজল নয়নে মাজারে উপস্থিত হন।

শহীদ বরকতের মাতা ও ভগ্নীর উপস্থিতি গোরস্তানে উপস্থিত সহস্র জনতার আত্মসংবরণের বাঁধ ভেঙে দেয়। কারো পক্ষে এই সময় অশ্রু-সংবরণ সম্ভব হয় না। একদিকে চোখে বেদনা-অশ্রু, অন্যদিকে ওঠে বিজয়ের হাসি, সে এক অপূর্ব দৃশ্য। বহু মহিলাকে কালো কাপড় পরে কবর জিয়ারত করতে দেখা যায়।

গোরস্তানে মওলানা ভাসানী শহীদ বরকতের মা-কে সান্ত্বনা দিয়ে তাঁকে বাংলার সাড়ে চার কোটি সন্তানের জননী বলে উল্লেখ করেন।

এইদিন সমগ্র শহরে সর্বপ্রকার কাজকর্ম স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্ধ থাকলেও একমাত্র আদমজী পরিচালিত ‘মর্নিং নিউজ’ ও মুসলিম লীগের ‘আজাদ’ পত্রিকার অফিস দুটির কাজ

চালু থাকে এবং ওই প্রতিষ্ঠান দুটির মালিকগণ শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তাঁদের কাজ বন্ধ রাখা থেকে বিরত থাকেন।

রাজধানীর কর্মময় জীবন সম্পূর্ণরূপে নিস্তেজ হয়ে যায়। একমাত্র পুলিশ ও সরকারি যানবাহন ছাড়া আর কোনো প্রকার যানবাহন দেখা যায় নি। সিনেমা হলের মালিকগণ বেলা ৩টার শো শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য বন্ধ রাখেন।

সকাল ৯টায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের পর মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের পাশে মওলানা ভাসানী, মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার ও শহীদ বরকতের মা যুক্তভাবে শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই উপলক্ষে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মওলানা ভাসানী ১৯৫২ সালের ভাষা–আন্দোলনে গুলি চালানোর জন্য সরকারের নিকট তদন্ত দাবি করেন। বলেন, উক্ত গুলি চালনায় ৭ ব্যক্তি শহীদ হয়েছিলেন, তা প্রমাণ করার মতো যথেষ্ট তথ্য তাঁর কাছে আছে।

মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার বাংলাভাষার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণেও ভাষা–আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে একটি শহীদমিনার নির্মাণ করা হয়। সকাল দশটায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শহরের ছাত্রছাত্রীদের এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের যে সভা হয় তার কথা আর একটু বলি। আরমানিটোলা ময়দানে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে এই সভা হয় বেলা ২টায়। ওই সময়ের বহু পূর্বেই সভাস্থল জনসমুদ্রে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত এত লোক হয় যে তিল ধারণের জায়গা থাকে না। ময়দানের পাশের রাস্তাগুলিতেও জায়গা হয় না, বাড়ির ছাদে ও বারান্দায় অসংখ্য লোক শ্রদ্ধাপ্লুত নয়নে জনসভার বক্তৃতা শ্রবণ করেন। সমাজতন্ত্রী ও এম. এল. এ. নেতা পুলিন দে, যুবনেতা মোহাম্মদ তোয়াহা, আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক অধ্যাপক আবদুল হাই, মহীউদ্দিন

আহমদ, আবদুল আওয়াল, আবদুস সাত্তার, কামরুজ্জামান (এম. এল. এ), গণতন্ত্রী দলের আলী আশরাফ, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের রুহুল আমীন, খেলাফতে রব্বানী পার্টির আবদুল গফুর, মহিলা সমিতির শামসুন্নাহার, বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আবদুল মোমিন তালুকদার, তমদ্দুন মজলিসের হাসান ইকবাল ও রিকশা ইউনিয়নের সেলিম বক্তৃতা করেন।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের সময় ছাত্রজনতার উপর পুলিশের গুলি চালনা সম্পর্কে নতুন করে তদন্তের দাবি করা হয়। অন্য প্রস্তাবে মেডিক্যাল কলেজ ক্রসিঙের নাম শহীদ এভিনিউ ও শহীদদের নাম অনুসারে তার চারদিকের রাস্তাগুলির নামকরণের জন্য পৌর কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দপ্তরের নিকট দাবি করা হয়।

এছাড়া, বাংলা ভাষার প্রতি সহানুভূতিশীল নন এমন সব প্রতিক্রিয়াশীলদের খেয়াল-খুশির উপর বাংলা একাডেমীর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে পূর্ববঙ্গ সরকার যেভাবে জনসাধারণের দাবির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেছেন সভায় তার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়।

অন্যান্য প্রস্তাবে পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, কালাকানুন বাতিল, সকল রাজবন্দীর অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানানো হয়।

সভা শেষে বিরাট মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। মওলানা ভাসানী তা পরিচালনা করেন। আরমানিটোলা ময়দানে সন্ধ্যায় গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

১৯৫৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস উদ্‌যাপনের এই বিবরণ থেকে আজকের মানুষ তৎকালের আবেগের কিছু স্পর্শ লাভ করবেন।

১৯৫৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবসে ঢাকার রাজপথে প্রভাতফেরীর গান হিসাবে তোফাজ্জল হোসেনের গান গাওয়া হয়। তার প্রথম চার ছত্র এইরূপ :

শহীদী খুন ডাক দিয়েছে
আজকে ঘুমের ঘোরে

আজ রক্তপথের যাত্রী মোরা
নূতন আলোর ভোরে।।

শহীদ আবুল বরকত, যতদূর জানা যায়, প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু তিনি একেবারে রাজনীতি অচেতনও ছিলেন না। ভাষা-আন্দোলন এবং গণ-আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর একটি সুস্থ গণমুখী চেতনা ছিল। তাঁকে এইসব আন্দোলনে যোগ দিতে দেখা গেছে।

তাঁর আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি বংশগতভাবেই ছিলেন অতিরিক্ত লম্বা মানুষ। বর্তমান লেখক তাঁর পিতা ও অন্য ভাইদের দেখেছেন। তাঁরাও ছিলেন অসম্ভব লম্বা। তাঁর বাবা এত লম্বা ছিলেন যে অনেক ঘরের দরজা তাঁকে হেঁট হয়ে পার হতে হতো। এই দৈহিক দৈর্ঘ্যের জন্য তাঁরা এলাকায় পরিচিত ছিলেন। হাসান হাফিজুর রহমানের একটি কবিতায় বরকতের এই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে। কবিতাটির অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি। শহীদ-স্মারক এই কবিতায় অন্যান্য শহীদ সম্পর্কেও হৃদয়স্পর্শী উল্লেখ আছে।

আম্মা তার নামটি ধরে একবারও ডাকবে না তবে আর?
ঘূর্ণিঝড়ের মতো সেই নাম উন্মথিত মনের প্রান্তরে
ঘুরে ঘুরে জাগবে, ডাকবে,
দুটি ঠোঁটের ভেতর থেকে মুক্তোর মতো গড়িয়ে এসে
একবারও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না, সারাটি জীবনও না?

কি করে এই গুরুভার সইবে তুমি, কতো দিন?
আবুল বরকত নেই সেই অস্বাভাবিক বেড়ে ওঠা
বিশাল-শরীর বালক, মধুর স্টলের ছাদ ছুঁয়ে হাঁটতো
যে তাকে ডেকো না ;
আর একবারও ডাকলে যে ঘৃণায় তুমি কুঁচকে উঠবে--
সালাম, রফিকউদ্দিন, জব্বার--কি বিষণ্ন থোকা-থোকা নাম ;
এই এক সারি নাম তার বর্শার তীক্ষ্ণ ফলার মতো এখন হৃদয়কে হানে ;

বিচ্ছেদের জন্যে তৈরি হওয়ার আগেই আমরা ওদেরকে হারিয়েছি
কেননা, প্রতিক্রিয়ার গ্রাস জীবন ও মনুষ্যত্বকে সমীহ করে না ;

ভেবে ওঠার আগেই আমরা ওদেরকে হারিয়েছি
কেননা প্রতিক্রিয়ার কৌশল এক মৃত্যু দিয়ে হাজার মৃত্যুকে ডেকে আনে।

আর এবার আমরা হারিয়েছি এমন কয়জনকে
যারা কোনদিন মন থেকে মুছবে না,
কোনদিন কাউকেও শান্ত হতে দেবে না ;
যাদের হারালাম তারা আমাদের বিস্তৃত করে দিয়ে গেল
দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত, কণা কণা করে ছড়িয়ে দিয়ে গেল
দেশের প্রাণের দীপ্তির ভেতর মৃত্যুর অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে।
আবুল বরকত, সালাম, রফিকুদ্দিন, জব্বার
কি আশ্চর্য, কি বিষণ্ন নাম, একসার জ্বলন্ত নাম

মহান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের আবুল বরকত একজন অমর শহীদ। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে মরণোত্তর একুশে পদক (২০০০) প্রদান করে।

বশীর আল্‌হেলাল

এই নিবন্ধের তথ্যাবলি দৈনিক 'আজাদ', সাপ্তাহিক 'নতুন খবর', বশীর আল্‌হেলাল রচিত 'ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস', রফিকুল ইসলাম রচিত 'ভাষা-আন্দোলন ও শহীদ মিনার' গ্রন্থ থেকে ও শেষোক্ত গ্রন্থে প্রদত্ত শামসুল বারী (মিঞা মোহন)-এর বক্তব্য থেকে গৃহীত হয়েছে।

স্মৃতিচারণ : শহীদ আবুল বরকত প্রসঙ্গ

হাসান হাফিজুর রহমান

"সে সময় কিছু সংখ্যক লোক আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধার বিনিময়ে পুলিশের ইনফরমার হিসেবে কাজ করলেও করতে পারে। প্রায় সব আন্দোলনেই এ ধরণের কিছু কিছু লোক থাকে যাদের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে কিছু সুযোগ–সুবিধা আদায় করে নেয়া। তবে কিছুদিন আগে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় বরকতকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক শুরু হয়েছে তার আমি তীব্র প্রতিবাদ করি। আমি যতটুকু জানি, বরকত নন–পলিটিক্যাল ছাত্র ছিল। বরকত আমার বন্ধুস্থানীয় ছিল। আমার সাথে সেও পলিটিক্যাল সায়েন্সে অনার্সে ভর্তি হয়েছিল। বরকত অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির ছেলে ছিল। কোন রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে বরকত জড়িত ছিল বলে আমার জানা নেই।"

সূত্র : 'একুশের সংকলন '৮০ : স্মৃতিচারণ', বাংলা একাডেমী, ১৯৮০।

গাজীউল হক

"মেডিক্যাল কলেজের গেট দিয়ে ছাত্ররা বেরোবার চেষ্টা করলে সেখানে পুলিশের বাধা এলো, লাঠিচার্জ হলো। পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের প্রায় খণ্ড যুদ্ধ শুরু হলো। এ সময়ে পুলিশ গুলী ছোঁড়ে এবং পুলিশের গুলীতে বরকত রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে যায়। বরকত ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এম. এ. শেষবর্ষের ছাত্র। দীর্ঘদেহী, বোধহয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘদেহী। শ্যামলা ছিপছিপে একহারা গড়নের। মুখটা শিশুর মতো সরল। আমাদের সঙ্গে বিশেষ করে হাসান হাফিজুর রহমান, আবু নাসের ওয়াহেদ প্রমুখের সঙ্গে বেশ হৃদ্যতা ছিল। রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে খুব সক্রিয় ছিল বলে জানি না। তবে ঐদিন সে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিল এবং শামসুল হক যখন রেস্তোরাঁয় বসে তাঁর বক্তব্য পেশ করছিলেন তখন বরকতও উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। পরে বন্ধু ড. রফিকুল ইসলামের কাছ থেকে বরকতের গুলী খাওয়ার ঘটনা শুনেছিলাম। পুলিশ সরাসরি গুলী

চালিয়েছিল এবং বরকত গুলীবিদ্ধ হয়েছিল। বরকতকে ছেলেরা ধরাধরি করে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। ড. রফিকুল ইসলাম (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক) বরকত যে বাসায় থাকত সেখানে খবর দেয়।”

সূত্র : ‘একুশের সংকলন ’৮০ : স্মৃতিচারণ’, বাংলা একাডেমী, ১৯৮০।

শামসুল বারী মিয়া (মিয়া মোহন)

“২০ নং ব্যারাকের মাঝামাঝি কামরার বারান্দায় দাঁড়িয়ে জিরোচ্ছিলাম। আমার দিকে এগিয়ে এলেন বরকত, ডাকলাম আবাই। বীরভূম জেলার সিউড়ির সৈয়দ জাকির সাহেবের আত্মীয়, জাকির সাহেবের ফরিদপুরের চাকুরিকালে আবাই মামুর সাথে পরিচয়। আমাকে দেখে এগিয়ে এলেন কিন্তু পড়ে গেলেন সাথে সাথে আমার হাত খানেক দূরে। পুলিশ ঢুকে পূর্ব থেকে সোজা গুলী ছুঁড়েছে। শফিকুর রহমান ১৭ নম্বরে থাকতেন, দৌড়ে এসে পানি ঢেলে দিলেন। ভেবেছিলেন টীয়ার গ্যাসের প্রতিক্রিয়া। আমি গুলীর কথা বললাম, ততক্ষণে পানির সাথে সাথে রক্ত দেখা দিয়েছে বারান্দার মেঝেতে। তলপেটে লেগেছে গুলী। গায়ে ছিল তাঁর নীল রংয়ের ফ্লাইং হাফশার্ট, পরণে খাকী প্যান্ট, পায়ে কাবলী স্যান্ডেল। তখন তাঁর দুই ঠ্যাং শফিকুর রহমান কাঁধে তুলে নিলেন আর মাথা নিলাম আমার কাঁধে। আমরা পশ্চিম দিক দিয়ে একটু ঘুরে দৌড়াতে লাগলাম তাঁর দীর্ঘ সুঠাম দেহটা নিয়ে। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল, তাঁরও কোমর নীচের দিকে ঝুলে দুমরে টপ্ টপ্ করে রক্ত ঝরছিল। আমার কাছে পানি চাইলেন, কিন্তু কোথায় পানি, সময় নাই, ভেজা রুমালটা দিলাম চুষতে। হোস্টেলের পায়খানাগুলোর কাছ দিয়ে হাসপাতালে যাবার যে ছোট গেটটা ছিল তার কাছে আসতে দু’তিনজন এগিয়ে এলেন সাহায্য করতে, আমার কাঁধ দিলাম তাঁর কোমরে। তিনি বললেন, ‘খুব কষ্ট হচ্ছে, বাঁচব না, বিষ্ণুপ্রিয়া ভবন, পুরানা পল্টনে সংবাদ পৌঁছে দেন।’ তাঁকে নিয়ে ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডে নামালাম। কেউ কেউ কেঁদে ফেলল। একজন নার্স

'কাপুরুষ' বলে গালাগালি দিয়ে প্রতিশোধ নেবার জন্য গেটে যেতে বল্লেন।

আমি দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই স্ট্রেচারে করে একজনের মৃতদেহ আনতে দেখলাম। মাথার খুলি উড়ে গেছে। নীচের দিকে খানিকটা ঘিলু ঝুলছে। আবুল বরকতকে অপারেশন করা হয়েছিল কিন্তু বাঁচানো যায় নি।"

সূত্র : 'শহীদ মিনার' (বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), রফিকুল ইসলাম

মোহাম্মদ সুলতান

"মিছিলকারীরা কতজন গ্রেফতার হল, কতজন আহত হয়েছিল তার হিসাব দেয়া আজ আর সম্ভব নয়, তবে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী সেদিন গ্রেফতার হয়েছিল। পুলিশ ভ্যানে, ট্রাকে বা বাসে তাদের তুলে নিয়ে গেছে। টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপের সময় বিশ্ববিদ্যালয় গেটও মুক্ত থাকেনি। শেলের আঘাতে আমার হাতের কলম কখন কোথায় উড়ে গেছে তা নিজেও জানি না। সেদিন দেড় ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ দু'হাজার ছাত্রী পুলিশের উদ্যত সঙ্গীনের খোঁচা ও লাঠির আঘাতে রমনার রাস্তা অভিশাপমুক্ত করতে চেয়েছিল-- তার মূর্তি আমি আজও ভুলতে পারি না। ভুলবার নয়। ভুলতে পারি না বরকতের কথা। সকাল নয়টায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শেষবর্ষের দীর্ঘদেহী ছাত্র অবুল বরকত মধুর রেস্তোঁরার বারান্দায় (পুরোটাই অবশ্য তখন বারান্দা ছিল) বগলে একতাড়া পোষ্টার নিয়ে ছুটোছুটি করছে। তখনও সে কেন পোষ্টার নিয়ে ঘুরছে জানতে চাইলে উত্তর দিয়েছিল, আর ক'টা তো পোষ্টার রয়েছে এই বেলা লাগিয়ে দিই। কাজে লাগবে। এটাই ছিল তার সাথে আমার শেষ সাক্ষাৎ। জনারণ্যে মিছিলকারীদের মাঝে সে মিশে গিয়েছিল। বিকেল চারটায় জানতে পারলাম মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসের ১ নং শেডের বারান্দায় তলপেটে গুলী খেয়ে বরকত মারা গেছে। বরকত লাল রক্তে স্নাত হয়ে বাংলা ভাষার মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেল। বরকত যেখানে শহীদ হয়, ঠিক সেখানেই এখন উদ্ধত গর্বে মাথাতুলে দাঁড়িয়ে আছে শহীদ

মিনার। এর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন আর এক শহীদের মাতা।”

সূত্র : ‘একুশের সংকলন ’৮০ : স্মৃতিচারণ’ : বাংলা একাডেমী, ১৯৮০

ড. রফিকুল ইসলাম

“শহীদ বরকত গুলীবিদ্ধ হলে তাঁর বন্ধু মিয়া মোহন (এখন ঢাকা হাইকোর্টে ওকালতি করেন) তাঁকে বহন করে ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যান। তখন মিয়া মোহন আমাকে বলেছিলেন বরকতের বাড়িতে খবর দিতে, তিনি আমাকে বরকতের বাড়ির ঠিকানাও দিয়েছিলেন, আমরা বরকতের বাড়িতে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলাম। ২১শে ফেব্রুয়ারিতে গুলী চলার পর পরই হাসান হাফিজুর রহমান, বোরহানুদ্দীন খান জাহাঙ্গীর এবং আমি তিনজনে বেগম বাজারের এক প্রেসে গিয়ে একটি লিফলেট ছাপানোর ব্যবস্থা করি, সে লিফলেট আমরা প্রচার করেছিলাম।

বরকত সম্পর্কে যে কুৎসা একটি পত্রিকায় উঠেছিল সে বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে লিখেছি। নূরুল আমিনের সময়ও বলা হয়েছিল--যারা গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে--তারা কালপ্রিট, ইন্ডিয়ার এজেন্ট, কমিউনিষ্ট, দেশের দুশমন ইত্যাদি। ফলতঃ বরকতের বিষয়ে যা যা বলা হয়েছিল তা সবই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং বানোয়াট। ভাষা-আন্দোলনের শহীদের ভাবমূর্তি নষ্ট করাই ঐ প্রচারণার উদ্দেশ্য।”

সূত্র : ‘একুশের সংকলন ’৮০ : স্মৃতিচারণ’, বাংলা একাডেমী, ১৯৮০।

সংবাদ শিরোনামে শহীদ
বরকতের মা

বরকত জননীর ঢাকা আগমন

(ইউনিভার্সিটি রিপোর্টার)

ভাষা-আন্দোলনের বীর শহীদদের স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে মেডিক্যাল কলেজের পার্শ্বে নবনির্মিত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শরীক হওয়ার জন্য অন্যতম শহীদ আবুল বরকতের বৃদ্ধা মাতা হাসিনা বেগম গতকল্য বুধবার স্বগ্রাম হইতে ঢাকা আগমন করিয়াছেন।

অদ্য সকালে এই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হইবে। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে খুব সম্ভবত বরকত জননীই মিনারটির উদ্বোধন করিবেন। শহীদ বরকতের জননী হাসিনা বেগম গতকল্য ঢাকায় প্রদত্ত এক বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রদের মঙ্গল কামনা করিয়াছেন।

শহীদ দিবস পালনোপলক্ষে এখানে আগমনের পর তিনি বলেন, মাতৃভাষা আন্দোলনের ফলে আমি আমার একটি পুত্র হারাইলেও পূর্ব পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ ছাত্রই আমার পুত্রের স্থান দখল করিয়া আছে।

শহীদ মিনার নির্মাণের জন্য তিনি প্রাদেশিক সরকারকে ধন্যবাদ জানাইয়া বলেন যে, যাহাদের প্রাণের বিনিময়ে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার অধিকার লাভ করিয়াছে, তাহারা চিরদিন অমর থাকিবে। তিনি শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

আজাদ
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩
৮ ফাল্গুন ১৩৬৯

বরকত জননী কর্ত্তৃক শহীদ মিনারের উদ্বোধন : অমর ২১শে স্মরণে ছাত্র জনতার অপূর্ব মিছিল

বাংলা ভাষা ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের বজ্রকঠোর সঙ্কল্প গ্রহণ

অফিস-আদালতে ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে মাতৃভাষার স্বীকৃতি দাবী

(ইউনিভার্সিটি রিপোর্টার)

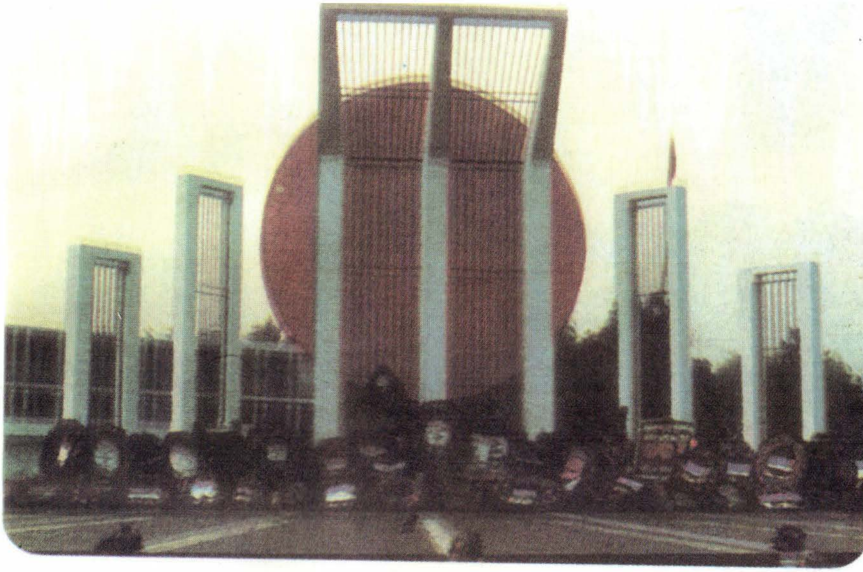
গতকল্য বৃহস্পতিবার ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতি রক্ষার জন্য নব-নির্মিত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহীদ বরকতের ৭৩ বৎসর বয়স্কা জননী হাসিনা বেগম এই মিনারের উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনের পর সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির চেয়ারম্যান এবং প্রাক্তন উজিরে আলা জনাব আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে মিনারের পাদদেশে অনুষ্ঠিত এক সভায় মোট আটজন বক্তা বক্তৃতা করেন। বক্তাগণ অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ এবং অন্যান্য সকল সরকারী পর্যায়ে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা ভাষা প্রবর্তনের দাবী জানান।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে শহীদদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য ২১শে ফেব্রুয়ারী সরকারীভাবে "শহীদ দিবস" ঘোষণা করার দাবী জানানো হয়।

বিভিন্ন বক্তা তাঁহাদের বক্তৃতায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, বর্তমান সরকার কর্তৃক কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করার দ্বারা জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আর এক দফা জয় সূচিত হইল।

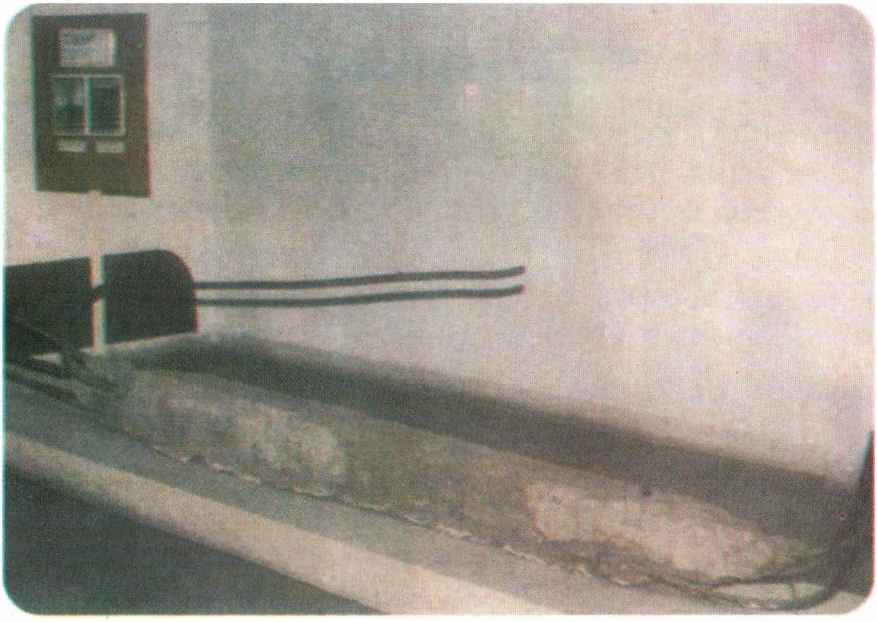
গতকাল সহস্র তাজা প্রাণ এবং জনসাধারণের বিরাট মিছিলটি অত্যন্ত শৃংখলার সহিত ক্রমে ক্রমে ঢাকেশ্বরী রোড, মেডিকেল কলেজ হোস্টেল, বক্‌শী বাজার, টি. বি. ক্লিনিক, রেলওয়ে হাসপাতাল, জিন্নাহ্ এ্যাভিনিউ, আব্দুল গনি রোড, কার্জন হল প্রভৃতি প্রদক্ষিণ করিয়া ঢাকা মেডিকেল কলেজের পার্শ্বে নব-নির্মিত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাদদেশে আসিয়া জমায়েত হয়। এই মিছিলে প্রাক্তন উজিরে আলা জনাব আতাউর রহমান খান, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় উজির জনাব জহীরুদ্দীন, শাহ্ আজিজুর রহমান, সৈয়দ আজিজুল হক, শেখ মুজিবর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দও অংশগ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে শহীদ বরকতের বৃদ্ধা মাতা



কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার

বর্ধমান ভবন নবায়নের পরে ভাষাশহীদ রফিকউদ্দিন আহমদের মাতা রাফিজা খাতুন কর্তৃক উদ্বোধন। মহাপরিচালক কাজী মনজুরে মওলা শহীদ-মাতাকে গোলাপ উপহার দিচ্ছেন

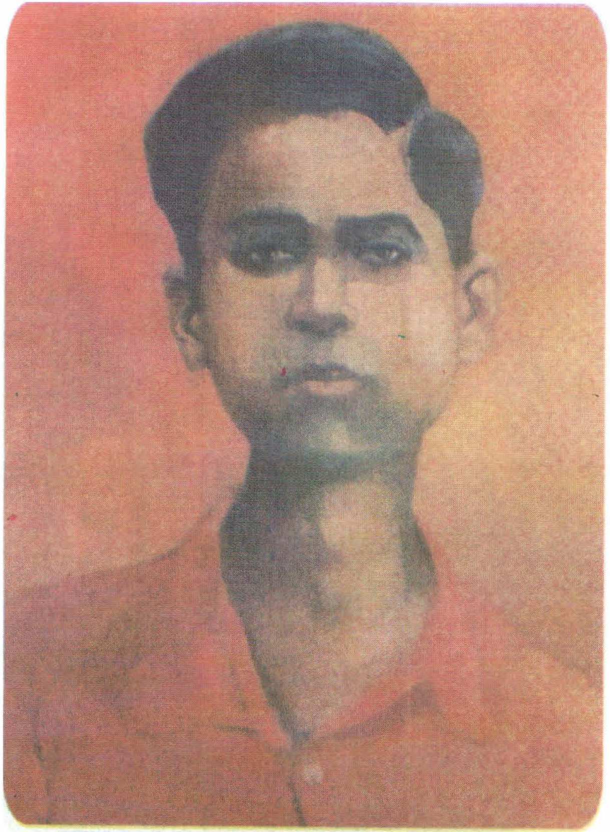




১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তান-হানাদার বাহিনী কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার

বর্ধমান ভবন। পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী (১৯৪৮-১৯৫৪) নূরুল আমীন এই ভবনে বাস করতেন। ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর পূর্ববঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার এই ভবনকে বাংলা একাডেমীতে রূপান্তরিত করেন

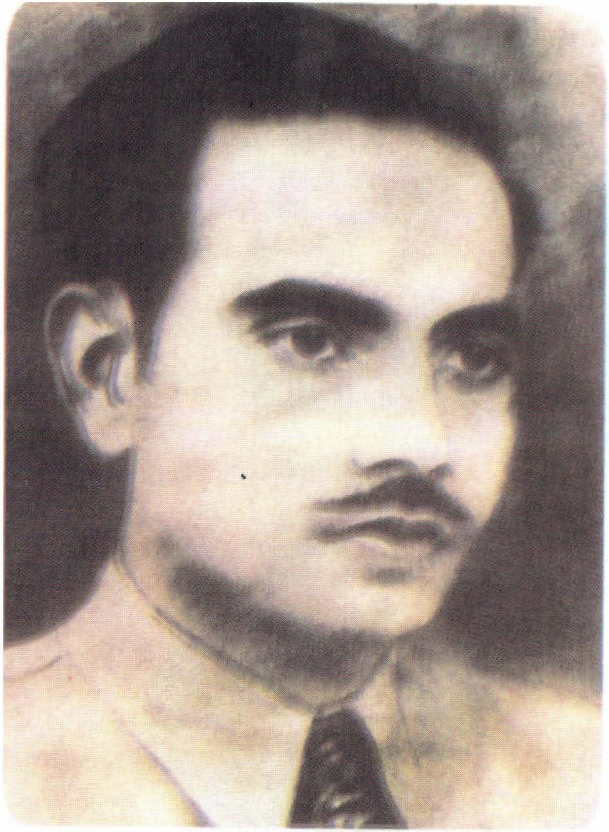




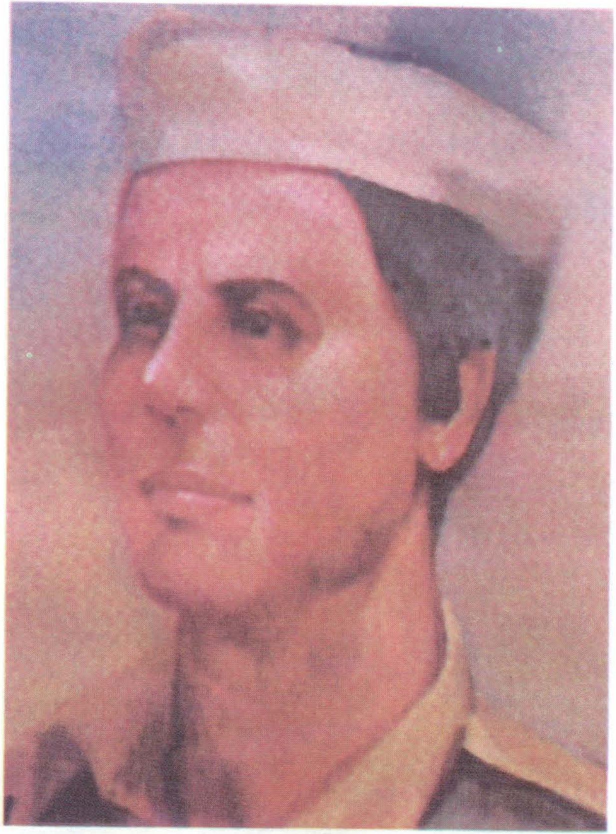
ভাষাশহীদ আবুল বরকত



ভাষাশহীদ আবুল বরকতের কবর
আজিমপুর গোরস্তান, ঢাকা



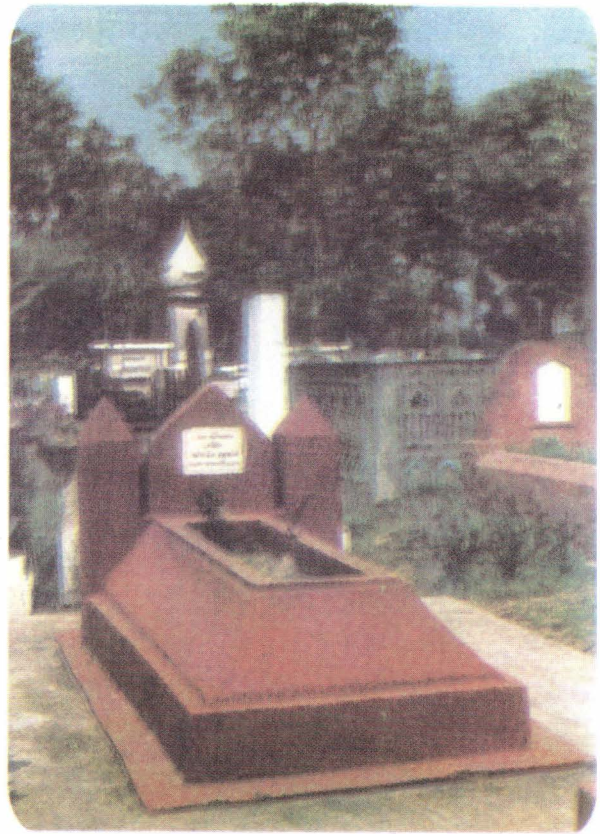
ভাষাশহীদ শফিউর রহমান



ভাষাশহীদ আবদুল জব্বার



ভাষাশহীদ শফিউর রহমানের স্ত্রী আকিলা খাতুন



ভাষাশহীদ শফিউর রহমানের কবর
আজিমপুর গোরস্তান, ঢাকা



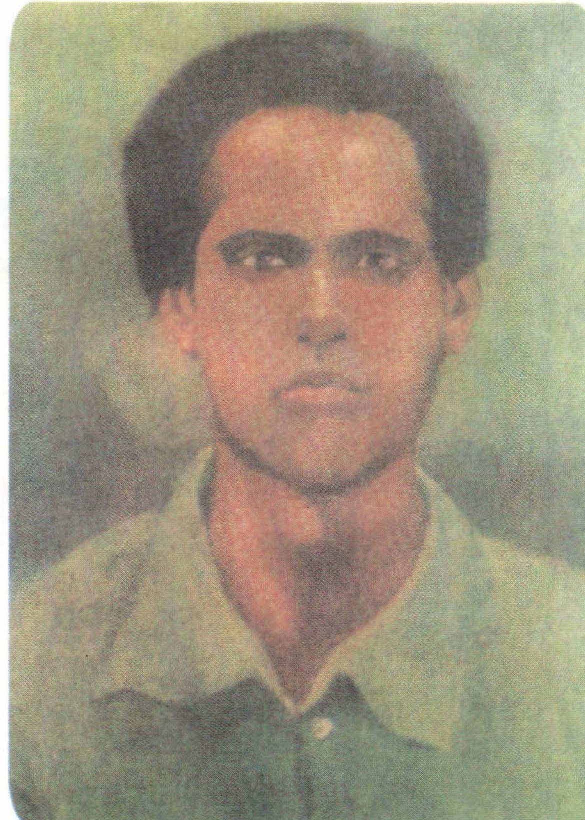
পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ভাষাশহীদ শফিউর রহমান



'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো'-গানের সুরকার
আলতাফ মাহমুদ ('৭১-এ শহীদ)



ভাষাশহীদ রফিকউদ্দিনের মাতা রাফিজা খাতুন



ভাষাশহীদ রফিকউদ্দিন আহমদ



ভাষাশহীদ আবদুস সালাম
প্রতিকৃতি অঙ্কন : সাজাহান আহামেদ বিকাশ
স্থিরচিত্র : রুমি সিদ্দিকী

হাসিনা বেগম কবর জেয়ারত করিয়া শহীদ তরুণ ছাত্র–ছাত্রীর কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত কাকলীতে রক্তস্নাত অমর একুশে ফেব্রুয়ারীর বেদনাময় ইতিহাসের প্রতিধ্বনি বহন করিয়া আনে আর একটি সকাল। প্রাণের ভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষায় ১১ বৎসর পূর্বে যে সকল বীরের বুকের রক্তে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হইয়াছিল, সেই শহীদদের পবিত্র স্মৃতির প্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য গতকল্য (বৃহস্পতিবার) সঙ্গীতমুখর হাজার হাজার ছাত্র–ছাত্রী এবং জনসাধারণ সূর্যোদয়ের বহু পূর্ব হইতেই প্রভাতফেরী বাহির করিয়া গান গাহিতে গাহিতে আজিমপুর কবরস্তানে আগমন করে। অতঃপর তাহারা শহীদ বরকত ও সালামের কবর জেয়ারতের পর পুষ্পমাল্য প্রদান করে।

ভাবগম্ভীর পরিবেশে কবর জিয়ারতের পর হাজার হাজার ছাত্র–ছাত্রী মিনারে উপস্থিত হইয়াছিল।

পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি হাজার হাজার ছাত্র–জনতার আবেগ–আকুল দৃষ্টির সম্মুখে কালো ফিতা কাটিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে মিনারের উদ্বোধন করেন।

অসংখ্য পুষ্প এবং লতাপাতা সজ্জিত মিনারের ধাপগুলী অতিক্রম করিয়া বরকত জননী একগুচ্ছ পুষ্প প্রদান করেন।

অতঃপর জনাব আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে শহীদ মিনারের পাদদেশে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মোট আট জন বক্তা বক্তৃতা করেন।

ছাত্রনেতা জনাব ওবায়দুর রহমান বলেন, এইদিন শপথ গ্রহণের দিন। ভাষা আন্দোলনের মূলে যে গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবী, তাহা আদায়ের সংগ্রাম আজও অব্যাহত।

তিনি মায়ের মুখের ভাষাকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ছাত্র ও জনসমাজের প্রতি কঠোর ত্যাগ স্বীকারের আহ্বান জানান এবং প্রাদেশিক পরিষদে বাংলা ভাষা চালু করার দাবী জানান।

কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ আনীস বলেন, আমাদের বিচার করা উচিত আমরা বাংলা ভাষাকে কতটুকু মর্যাদা দিতে পারিয়াছি। কতটুকু আমাদের আচার ব্যবহারে, কাজে-কর্মে ব্যবহার করিতে পারিয়াছি। তিনি বন্দী ছাত্রদের মুক্তি এবং সর্বপ্রকার বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়া দেশে গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান।

জনাব সিদ্দিকুর রহমান বলেন, যারা শহীদ হইয়াছেন তাহাদের প্রতিটি রক্তকণার মূল্য সেইদিন আদায় হইবে যেদিন আমরা বাংলা ভাষার পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইব। তিনি অর্থনৈতিক অবহেলা ও সর্বপ্রকার অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। জনাব হায়দার আকবর খান বলেন, আজিকার এই দিন দাবী আদায়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের দিন। ভাষা আন্দোলনের মূলে যে গণতান্ত্রিক অধিকার চির জাগ্রত তাহা এখনো মানিয়া লওয়া হয় নাই। বক্তৃতায় ছাত্রনেতা জনাব আবুল হাসনাত এবং মীজানুর রহমান শেলী শহীদদের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া দেশের গণতান্ত্রিক দাবী আদায়ের সংগ্রাম জোরদার করার

আহ্বান জানান। রিক্সাচালক সমিতির পক্ষ হইতে বক্তৃতা করেন জনাব সুলতান আহমদ। এছাড়াও ছাত্রনেতা জনাব শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ ও জনাব সিরাজুল আলম বক্তৃতা করেন।

সভাপতির ভাষণ

জনাব আতাউর রহমান খান বলেন, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় রক্তদান ব্যতীত কোনো মহৎ কাজ সিদ্ধ হয় না। এই দিনের আন্দোলনের মধ্য দিয়া আমরা যে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছি তাহার নিকট আগামী দিনের সকল চক্রান্ত ধূলিসাৎ হইতে বাধ্য।

বক্তৃতা শেষে তিনি হাত তুলিয়া শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন।

আতাউর রহমানের প্রতি
জনতার ক্ষোভ প্রকাশ

তাঁহার ওজারতির আমলে কেন রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলাকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয় নাই এবং বর্তমান সরকার কর্তৃক সমাপ্তির জন্য শহীদ মিনারের নির্মাণকার্য তাহারা কেন অসমাপ্ত রাখিয়াছিলেন, সে সম্পর্কে জনতার পক্ষ হইতে জনাব আতাউর রহমান খানকে প্রশ্ন করা হইলে সভায় কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ইহাতে শহীদ মিনারের ভাব-গম্ভীর পরিবেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পরে অবশ্য পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা সম্ভব হয়।

আজাদ
২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩
৯ ফাল্গুন ১৩৬৯

যিনি আজ কোটি কোটি
বরকতের মা

মায়ের মুখের ভাষার স্বীকৃতি আদায় করতে গিয়ে যে সব তরুণ প্রাণ সেদিন অকালে ঝরে পড়েছিল, তাদের অন্যতম-- এক বরকতকে হারিয়ে যে হাসিনা বেগম আজ

এদেশের কোটি কোটি বরকতের মায়ের আসনে অধিষ্ঠিতা, প্রতি বছরের ন্যায় এবারের অমর ২১শে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানাদিতেও শরীক হওয়ার জন্য এই বৃদ্ধ বয়সেও (৭৩ বৎসর) তিনি ছোট ভাই জনাব আব্দুল কাদেরের (৭০ বৎসর) হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ থেকে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় এসে পৌঁছেছেন।

ইত্তেফাক
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৫
৯ ফাল্গুন ১৩৭১

শহীদ বরকতের মায়ের শুভেচ্ছা বাণী

পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে শহীদ বরকতের মায়ের শুভেচ্ছা বাণী :

আজ থেকে ১৭ বছর আগে এই অমর একুশে ফেব্রুয়ারীতে আমি আমার প্রিয় সন্তান আবদুল বরকতকে হারিয়েছি। বরকতকে হারিয়ে আমি যেমন দুঃখ পেয়েছি তেমনি আনন্দও পেয়েছি। আনন্দ পেয়েছি এই জন্য যে, আমার বরকত প্রাণ উৎসর্গ করেছে নিজের মাতৃভাষার জন্য। এবং আমি এক বরকতকে হারিয়ে পেয়েছি পূর্ব পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের যারা আমার কাছে বরকতের মতোই সমান প্রিয়। আমি আজ লক্ষ লক্ষ বরকতের মা এবং সেই খুশীতে আমার বুক ভরে আছে। তাই প্রতি বছর আমি তোমাদের ডাকে এই দিনের শোভাযাত্রায় যোগ দেয়ার জন্য সুদূর মুর্শিদাবাদ থেকে ঢাকা আসি। এবারও তোমাদের ডাকে আমার ঢাকা আসার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য এবং পাসপোর্ট ভিসার কড়াকড়ির জন্যে আমি এবার আসতে পারছি না। তার জন্য আমি খুবই দুঃখিত।

আমার শুভেচ্ছা রইল তোমাদের জন্য। তোমরা যেভাবে মাতৃভাষার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছ তার জন্য আমি খুবই আনন্দিত। আমি খুবই আশান্বিত যে, তোমরা তোমাদের সংগ্রাম আরও সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যাবে এবং তোমরা সফল

হবে যেদিন পাকিস্তানের সমস্ত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী অফিস-আদালত প্রভৃতিতে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা যথাযথ মর্যাদা পাবে। একুশে ফেব্রুয়ারী অমর হোক। বাংলা ভাষা অমর হোক।

হাসিনা বেগম
গ্রাম : বাবলা
পো: তালিবপুর
জেলা : মুর্শিদাবাদ
৫-২-৬৯

দৈনিক পাকিস্তান
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
৯ ফাল্গুন ১৩৭৫
সংকলক : নূরুল ইসলাম

শহীদ রফিকউদ্দিন আহমদ : জীবন-কথা

১৯৫২-র মহান ভাষা-আন্দোলনের অমর শহীদদের অন্যতম ছিলেন রফিকউদ্দিন আহমদ। সরকারি নথিপত্রানুযায়ী তাঁর জন্ম ১৯২৯ সালে। জনাব (বর্তমানে ডক্টর) সৈকত আসগরের 'ভাষা-আন্দোলন ও শহীদ রফিক'[১] বইয়ে সংযোজিত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সার্টিফিকেটে দেখা যায় ১৯৪৮ সালের ১লা মার্চ তারিখে শহীদ রফিকের বয়স ১৯ বছর ১ মাস দেখানো হয়েছে। সে হিসাবে ১৯৫২-এ তার বয়স হয় ২৩ বছর। কিন্তু এই হিসাব যথাযথ নয়।

বাংলাদেশে আমাদের প্রায় সকলেরই বয়স প্রবেশিকা পরীক্ষার সার্টিফিকেটে কিছু কম দেখানো হয়। শহীদ রফিকের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। রফিকের বয়স বছর তিনেক কমিয়ে দেখানো হয়েছিলো বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে। ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখের দৈনিক আজাদ পত্রিকায় শহীদ রফিকের ভগ্নিপতি জনাব মোবারক আলী খান বলেছেন মৃত্যুর সময় রফিকের বয়স ছিলো : 'ঊনিশ/কুড়ি বছর'। এই তথ্য সঠিক নয়। কারণ ১৯৪৯-এর ৫ই নভেম্বর-এ ইস্যুকৃত প্রবেশিকা পরীক্ষার সার্টিফিকেটেই তাঁর বয়স ১৯ বছর ১ মাস দেখানো হয়েছে। যাই হোক, মোবারক আলী খান পরে অবশ্য বলেছেন যে, 'রফিক ১৯২৬ সালের ৩০শে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন'।[২] রফিকের মা রাফিজা খাতুনও (১৯০৫-৮৮) শহীদ রফিকের এই জন্ম তারিখ অনুমোদন করেছেন।[৩] ফলে শহীদ হবার সময়ে রফিকের বয়স ২৬ বছর ছিলো বলে ধরে নেয়াই সঙ্গত।

---

১. ভাষা-আন্দোলন ও শহীদ রফিক : সৈকত আসগর (দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ) প্রকাশক মোহাম্মদ খলিলুর রহমান চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, সিঙ্গাইর, মানিকগঞ্জ।

২. বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন শহীদ স্মরণে স্মরণিকা সম্পাদক মুহম্মদ ছমিরুদ্দীন খাঁ, ঢাকা ১৯৭৪

৩. প্রাগুক্ত, সৈকত, আসগর পৃ. ১৫৯

শহীদ রফিকের জন্ম হয় তৎকালীন ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত সিংগাইর থানার বলধারা ইউনিয়নের পারিল বলধারা গ্রামে। পারিল বলধারা এককালে খুব বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিলো। ব্রিটিশ আমলেই এই গ্রামে ছিলো ডাকঘর, ইউনিয়ন অফিস এবং একটি সরকারি ডিসপেনসারী। পারিল বলধারার সেন পরিবারেরও দেশব্যাপী খ্যাতি ছিলো। পারিল বলধারা এখন মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলার অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রাম।

শহীদ রফিকের বাবার নাম আবদুল লতিফ। মা রাফিজা খাতুন। রফিকেরা ছিলো পাঁচ ভাই ও দুই বোন। ভাইদের মধ্যে রফিক সবার বড়। অন্য ভাই–বোন আবদুর রশীদ (১৯৩১–৮৭), আবদুল খালেক (১৯৩৪–), আবদুস সালাম (১৯৪৩–৭২), খোরশেদ আলম (১৯৪৭–) এবং আলেয়া বেগম (১৯৩৮–) ও জাহানারা বেগম (১৯৪৫–)।

সৈকত আজগরের 'ভাষা–আন্দোলন ও শহীদ রফিক' বই থেকে জানা যায় : 'রফিকের বাবা কলকাতায় ব্যবসা বাণিজ্য করতেন। ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান বিভাগের দু'তিন বছর পর তিনি ঢাকায় চলে আসেন।' এবং জামাতা মোবারক আলী খানের হাজী ওসমান খাঁন রোডের বুক বাইন্ডিং কারখানায় আশ্রয় নেন। পরে ওই জামাতার পরামর্শে বাবু বাজার এলাকায় আকমল খান রোডে পারিল প্রিন্টিং প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল যৌথ ব্যবসা। এই ব্যবসায় আবদুল লতিফের অপর অংশীদার ছিলেন ফেলু খাঁ। ফেলু খাঁ শহীদ রফিকের মামা। তিনিও কলকাতা থেকে ঢাকায় আসেন এবং আবদুল লতিফের সঙ্গে মোবারক আলী খানের আস্তানাতেই উঠেন।

আবদুল লতিফ ও ফেলু খাঁর মধ্যে বছর দেড়েকের মধ্যেই ব্যবসা নিয়ে মতভেদ দেখা দেয় এবং দু'জন আলাদা হয়ে যান। প্রেসের যন্ত্রপাতি ও মালামাল বণ্টন করে নিয়ে আবদুল লতিফ তা বিক্রি করে দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু পুত্র রফিকের বিশেষ আগ্রহে তিনি বাদামতলী কমার্শিয়াল প্রেস নাম দিয়ে নতুন প্রেস ব্যবসা শুরু করেন।

শহীদ রফিকের বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন

শহীদ রফিকের বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন জনাব মোবারক আলী খান এবং রফিকের দুই সহপাঠী জনাব জালালউদ্দীন আহমদ (১৩৩০) এবং জনাব ইসমাইলউদ্দিন আহমদ। জালালউদ্দিন আহমদ সিংগাইর উপজেলার বায়রা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি বায়রা হাইস্কুলে শহীদ রফিকের সঙ্গে পড়তেন। ইসমাইলউদ্দিন আহমেদও বায়রা এবং মানিকগঞ্জ কলেজে রফিকের সঙ্গে পড়েছেন। তবে এঁদের মধ্যে মোবারক আলী খানের দেয়া তথ্য বিস্তৃত মূল্যবান। তিনি লিখেছেন :

'রফিক ছিল বাপ-মায়ের প্রথম সন্তান। শৈশবে গ্রাম্য স্কুলেই সে পড়শোনা করে। মরহুম আশরাফউদ্দিন চৌধুরী ও বীরেন্দ্রমোহন দত্তগুপ্ত শিক্ষকদ্বয়ের সুযোগ্য প্রশিক্ষণে অচিরেই রফিক প্রাইমারী শিক্ষা সমাপন করে।

রফিক বাল্যকালে কিছুটা চঞ্চল ছিল। তার ফলস্বরূপ গাছ হতে পড়ে যেয়ে তার হাত ভাঙ্গে এবং চিকিৎসার জন্য তাকে কলকাতায় যেতে হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে কলকাতা থাকতে হয় এবং এই সময় কয়েক বছর সে কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশনে শিক্ষা লাভ করে। দেশ বিভাগের কয়েক বছর পরে সে পুনরায় দেশে ফিরে আসে এবং বায়রা স্কুলে ভর্তি হয় এবং সেখান হতেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

'শহীদ রফিক সাহিত্যের ছড়া রচনায় পটু ছিল এবং সেলাই ও সুচীশিল্পে বেশ দক্ষ ছিল। সমাজকল্যাণ কাজে তার গভীর আগ্রহ ছিল। কলকাতা থাকাকালীন পারিল বলধারা যুবক সমিতির সে একজন অন্যতম কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য ছিল। পরিতাপের বিষয় সামাজিক বাদ-বিসম্বাদের ফলে এই সমিতি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে তখন মুসলিম ব্রাদার্স এসোসিয়েশন ও যুবক সমিতি নামে দুইটি পৃথক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এই সময়ে তরুণকর্মী রফিক দ্বিতীয়টির এবং আমি প্রথমটির সাথে সহকারী সম্পাদকরূপে যুক্ত হই। সমিতিদ্বয়ের অফিস ছিল তখন যথাক্রমে কলিকাতার ২১/১ ও ১২/১ বুদ্ধ ওস্তাগর লেনে।

'পরবর্তীকালে রফিক মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্রনাথ কলেজে বাণিজ্য বিভাগে অধ্যয়ন করে। এবং মাঝে মাঝে পিতার প্রেস ব্যবসা দেখাশুনা করে। কালক্রমে ঐ লিমিটেড পারিল প্রিন্টিং ভাগাভাগি হয়ে যায়। তখন রফিকের পিতা ভাগ্নোৎসাহ হয়ে প্রেস ব্যবসা ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তরুণ রফিক বণ্টনকৃত মালামাল নিয়ে কমার্শিয়াল প্রিন্টিং নাম দিয়ে অন্য একটি প্রেস দাঁড় করায় এবং তার অক্লান্ত কর্মনিষ্ঠায় তা সুচারুরূপে চলতে থাকে।' জনাব মোবারক আলী খানের বর্ণনায় রফিকের যে চেহারার বর্ণনা পাওয়া যায় তা এ রকম : রফিকের মাথার চুল কোঁকড়ানো, নাক লম্বা, দাঁত কিছুটা উঁচু, গায়ে হালকা নীল রংয়ের সার্ট, পরনে সাদা প্যান্ট, নেভী রংয়ের মোজা, কালি দেয়া পুরাতন ইংলিশ সু-এ ছিলো শহীদ রফিকের ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির বর্ণনা। সে যাহোক, শহীদ হওয়ার পূর্বে রফিক পিতার প্রেস ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং কমার্শিয়াল প্রেস নাম দিয়ে মানিকগঞ্জ থেকে মাঝে মাঝে ঢাকা গিয়ে তা দেখাশোনা করতেন।

শহীদ রফিকের সহপাঠী ইসমাইল উদ্দিন আহমেদ[৪] স্মৃতিচারণ করতে যেয়ে বলেছেন : গান বাজনার প্রতি ঝোঁক ছিলো রফিকের। স্কুলজীবন থেকেই সে রাজনীতি করতো। রফিক ছিলো বায়রা হাইস্কুলের ছাত্রদের লীডার। সে স্কুলের হোস্টেলে থাকতো।'[৫]

উপর্যুক্ত মোবারক আলী খানের বিবরণ থেকে আরো জানা যায় : '১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে পিতামাতার অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে রফিকের বিবাহকার্য স্বগ্রাম নিবাসী জনাব নাসিরুদ্দিন আহমদের কন্যা পানু বিবির সাথে সুস্থির হয়। তার পিতা উক্ত বিবাহের দিন তারিখ ধার্য করার জন্য ৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে দেশের বাড়িতে (পারিল বলধারা) যান এবং রফিক ঢাকায় থাকে। রফিক মাঝে মাঝেই তার ভগ্নিপতি মোবারক আলী খানের হাজী

৪ চারিগ্রাম শাহদাৎ আলী খান হাই স্কুল ও সিংগাইর হাই স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক।

৫ প্রাগুক্ত : সৈকত আসগর প. ১৬৫।

ওসমান গণি রোডস্থ বুক বাইন্ডিং-এর কারখানায় যাতায়াত করত। ২০শে ফেব্রুয়ারি সে প্রায় রাত দশটা পর্যন্ত মোবারক আলী খানের সাথে গল্প গুজব করেছিল। সেসময় মোবারক আলী তাকে পরামর্শ দেয় যে, আগামীকল্য রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের দিন। তাছাড়া সেদিনও মিছিল বের হয়েছে। এমতাবস্থায় সে যেন কোনো মিছিলে যোগ না দেয়।'

শহীদ রফিকের ভগ্নিপতি মোবারক আলী খানের নিকট থেকে প্রত্যক্ষ বিবৃতির মাধ্যমে রচিত এক লেখায় জানা যায় : '২১শে ফেব্রুয়ারি বেলা ২টার সময় জানা গেল মেডিকেলে গুলি চলেছে এবং তিনজন ছাত্র মারা গেছে। বেলা ৩টার সময় ফুলবাড়িয়া রেলগেট এবং নওয়াবপুরে গোলাগুলি চলেছে। রেলগেটে ছোট একটা শিশু গুলিতে মারা গেছে, এরূপভাবে চারিদিক থেকেই গোলাগুলির সংবাদ শ্রুত হল। সারা শহর যেমন আতঙ্কগ্রস্ত। মোবারক আলী সাহেব ঐ দিন সন্ধ্যা ৭টার সময় বাসায় ফিরেছিলেন। সাড়ে সাতটার সময় তার ঘরের জনৈক কর্মচারী ঘরে এসে খবর জানাল যে, রফিকের মাথায় গুলি লেগেছে এবং সে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আছে। মোশাররফ হোসেনের মারফত কর্মচারীটি তা জানতে পেরেছে। এ সংবাদে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি বাদামতলীস্থ কমার্শিয়াল প্রেসে যেয়ে মোশাররফ হোসেনের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং জানতে পারেন যে মোশাররফ হোসেনও এই খবর অন্য একজন লোক মারফত জানতে পেরেছে। বলাবাহুল্য, এ লোকটি ঘটনাস্থলে ছিল এবং সে রফিককে ভালোভাবেই চিনত।

'মোশাররফ হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি রিক্সাযোগে মেডিকেল হাসপাতালের দিকে বেরিয়ে পড়েন। বাদামতলী প্রেস হতে রওনা দিয়ে তারা নাজিমউদ্দিন রোড ধরে চানখাঁর পুল পার হয়ে যাবার পর রিক্সা ছেড়ে দেন এবং পায়ে হেঁটে অগ্রসর হতে থাকেন। বলাবাহুল্য ঐ এলাকায় তখন ১৪৪ ধারা এবং কারফিউ আদেশ বলবৎ ছিল। দু'পাশে মিলিটারী পাহারারত অবস্থায় তারা অনেকটা জ্ঞানহারা হয়ে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছেন। রাত তখন অনুমান ৯টার মতো। 'তারা ইমারজেন্সী ওয়ার্ডে জনৈক কর্মরত

ডাঃ বা কর্মকর্তার নিকট জানতে পারেন যে ৪টি লাশ রয়েছে। তবে এর মধ্যে তাদের লোকটার চেহারার বর্ণনা জানতে চান। তদুত্তরে মোবারক আলী খান জানান যে, রফিকের মাথার চুল কোঁকড়ানো, নাক লম্বা, দাঁত কিছুটা উঁচু, গায়ে হালকা নীল রংয়ের শার্ট এবং পরনে শাদা প্যান্ট, নেভী রংয়ের মোজা এবং কালি দেওয়া পুরাতন ইংলিশ সু (বলাবাহুল্য ঘটনার পূর্বদিনও মোবারক আলী সাহেব এই পোশাক পরিহিত অবস্থায়ই তাকে দেখেছিলেন)। কর্মকর্তাটি প্রশ্ন করেন তার কাছে কোনো কলম ছিল কি না? তদুত্তরে মোবারক আলী জানান যে, হ্যাঁ ছিল উহা পুরাতন সেফার্স। তৎপর কর্মকর্তাটি সেই কলমটা দেখালেন। মোবারক আলী উক্ত কলমটি যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে স্পষ্টই ঠাহর করতে পারলেন যে তা নিঃসন্দেহে রফিকের কলম। কারণ তিনি নিজেও ঐ কলমটা দিয়ে বারবার লিখেছেন। তার সন্দেহ দূর হলো। লাশ দেখতে চাইলে কর্মরত কর্মকর্তা বললেন, হাউজ সার্জেনের অনুমতি ব্যতীত তিনি লাশ দেখাতে অপারগ। পূর্বে তার নিকট থেকে অনুমতি নেওয়ার জন্য পরামর্শ দিলেন এবং একজন লোক দিয়ে তাদেরকে হাউজ সার্জেনের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। যার নিকট তারা গেলেন তিনি একজন রাত্রিকালে ডিউটিরত মহিলা কর্মী। সম্ভবত তিনি ইউরোপীয়ান মহিলা ; মোবারক আলী তার সাথে আধা উর্দু ও হিন্দী ভাষায় কথা বলে লাশ দেখার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি ইংরেজীতে উত্তর দিলেন যে, মিলিটারী কর্তৃপক্ষ প্রকোষ্ঠের তালা বন্ধ করে রেখে গেছে। সুতরাং তার পক্ষে এখন লাশ দেখানো সম্ভবপর নয়। অতএব তারা তার নিকট থেকে নিরাশ হয়ে যে প্রকোষ্ঠে লাশ ছিল, সেখানে চলে আসলেন এবং আগ্রহাতিশয্যে পায়ের উপর ভর করে উবু হয়ে তারা উভয়ে উক্ত প্রকোষ্ঠের জানালা দিয়ে লাশগুলি দেখতে চেষ্টা করলেন কিন্তু সেগুলো তাদের নাগালের বাইরে ছিল। সে সময়ে উক্ত বাঙালি বেয়ারাটি মোবারক আলীর নিকট আসলো এবং মোবারক আলীকে তাঁর কাঁধে দাঁড় করে লাশগুলি দেখার প্রয়াস নিলো, এবার মোবারক আলী তার কাঁধে দাঁড়িয়ে

জানালা দিয়ে দেখতে পেলো যে, পূর্ব পশ্চিমে লম্বা চারটি লাশ পূর্বদিকে মাথা রেখে পড়ে আছে, মেডিকেল হাসপাতালের সাদা চাদরে সেগুলো আবৃত ছিলো। তিনি রফিকের মাথার চুল ও পা-এর ইংলিশ সু দেখতে পেলেন, কারণ পা-এর দিকটা অনাবৃত ছিলো। উক্ত সু তিনি স্পষ্টতই সনাক্ত করতে পারলেন, উজ্জ্বল বাতির আলোতে পূর্বদিনের পালিশ করা জুতা চকচক করছিলো। বলাবাহুল্য, রফিকের উন্নত নাসিকা আচ্ছাদিত চাদরটিকে কিছুটা উঁচু করে রেখেছিলো এবং মাথার কোঁকড়ানো চুলের কিছুটা অংশ অনাবৃত থাকায় তিনি নিঃসন্দেহে ঠাহর করতে পারলেন যে, তা রফিকের লাশ। সঙ্গী মোশাররফ হোসেনও অনুরূপভাবে দেখলেন এবং তারা উভয়েই একমত হলেন, অতঃপর মোবারক আলী ও মোশাররফ হোসেন আবার ইমারজেন্সী শাখায় এসে লাশ ডেলিভারি লওয়ার কোনো উপায় আছে কিনা, তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় কর্মকর্তা অক্ষমতা প্রকাশ করে বললেন যে, সরকারি নির্দেশ ছাড়া এ লাশ তিনি কাহাকেও হস্তান্তর করতে পারেন না।

কোনো কোনো সূত্রে জানা গেল আজ রাত্রেই মিলিটারীর লোকেরা এ লাশ এখান থেকে সরিয়ে ফেলবে। কারণ ছাত্ররা উক্ত লাশ নিয়ে যাবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডিং-এ জটলা পাকাচ্ছে এবং তুমুল হট্টগোল করছে। এবং ভোর হলেই মেডিকেল হাসপাতালে প্রবেশ করে বলপূর্বক তারা উক্ত লাশগুলি নিয়ে মিছিল বের করবে। তাই ছাত্রদের এখানে আসার পূর্বেই মিলিটারীরা লাশ এখান থেকে সরিয়ে ফেলবে।

এমতাবস্থায় ঘটনা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে তারা উভয়েই হাসপাতালের অভ্যন্তরে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

রাত্রি যখন সাড়ে ১২টা মোবারক আলীর খেয়াল হলো দেশের বাড়িতে অবস্থানরত রফিকের পিতাকে সংবাদ দেওয়া দরকার। সেই গভীর রাত্রে রমনা অফিস হতে টেলিগ্রাম করলে পরদিনই হয়তো তিনি চলে আসতে পারবেন। মনে মনে এই ধারণা নিয়ে তিনি (মোবারক আলী) সেই গভীর রাত্রে ১৪৪ ধারা ও কারফিউ অগ্রাহ্য

করে একাকী রমনা টেলিগ্রাম অফিসের দিকে রওনা হয়ে পড়লেন। মোশাররফ হোসেন হাসপাতালেই রয়ে গেলেন। রমনা টেলিগ্রাম অফিসে যাওয়ার পথে ৫/৭ জন মিলিটারীর সাথে তার জবাবদিহি করতে হলো। টেলিগ্রাম অফিসে পৌঁছে তিনি দেখলেন সেই গভীর রাতেও তথায় রীতিমতো ভীড় জমে গেছে। অনবরত টেলিগ্রাম ইস্যু করা হচ্ছে। তিনিও একটি ফরম নিয়ে রফিকের পিতাকে অবিলম্বে আসবার জন্য একটি টেলিগ্রাম করে দিলেন। মেডিকেল হাসপাতালে প্রত্যাবর্তনের পথে অনুরূপভাবে তাকে পাহারারত মিলিটারীদের প্রশ্নবাণের উত্তর দিতে হলো। যাতায়াত বা টেলিগ্রাম করার ব্যাপারে দেড় ঘণ্টার মতো সময় অতিবাহিত হলো।

'মেডিকেল হাসপাতালে প্রত্যাবর্তন করে মোবারক আলী জানতে পারলেন যে, মিলিটারী প্রহরায় ইত্যবসরে লাশগুলি মেডিকেল হতে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং সঙ্গী মোশাররফ হোসেন সেখানে উপস্থিত নাই। রফিক, জব্বার, বরকত এই তিনজনের লাশ আজিমপুর দাফনের জন্য চলে গেছে। বরকতের মাতাপিতাও লাশের সাথে গেছেন। তা শুনে তিনি (মোবারক আলী) আজিমপুর গোরস্থানে গেলেন, রাত তখন পোহায়ে গিয়েছে। তিনি আজিমপুরে পৌঁছাবার পূর্বেই দাফন কার্য সমাধা হয়ে গেছে।

'মোবারক আলী খানের মতে রফিকের মাথায় গুলি লেগে শহীদ হয়েছে। সুতরাং রফিকই ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ।'

বর্তমান লেখকের বাড়ি সিংগাইর থানার চারিগ্রামে। চারিগ্রাম ও পারিল পাশাপাশি গ্রাম। ১৯৫২ সালে আমি চারিগ্রাম শাহাদৎ আলী খান হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। ছাত্র হত্যার সংবাদে আমরা বিক্ষুব্ধ হই। রফিকের হত্যার সংবাদে হই বিমূঢ়।

২২শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা থেকে লেখকের আত্মীয় জনাব আবদুল ওয়াহাব খান সেকালের দৈনিক মিল্লাতের একটি কপি নিয়ে চারিগ্রাম আসেন। ঐ পত্রিকার প্রথম পাতায়

রফিকের খুলি উড়ে যাওয়ার ছবি ছাপা হয়েছিল। আমাদের গ্রামের লোকেরা খুব সহজেই লাশের ছবি দেখে রফিককে সনাক্ত করতে সক্ষম হন।

১৯৫৭ সালে 'লালশার্ট' নাম দিয়ে দৈনিক আজাদের মুকুলের মহফিলে বর্তমান লেখকের একটি গল্প ছাপা হয়, গল্পের বিষয় ছিল রফিকের বিয়ে উপলক্ষে তাঁর ছোট ভাইয়ের একটি লালশার্টের আবদার। কিন্তু সেই লালশার্ট আসেনি এসেছিলো রফিকের রক্তভেজা শার্ট।

শহীদ রফিকের পরিবারের সদস্যরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধসহ সকল গণআন্দোলনে নিজেদের গভীরভাবে যুক্ত করেছেন এবং নিজেদের জীবনকে কখনোই দেশের স্বার্থের চেয়ে বড় মনে করেননি। তাইতো দেখি ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনেও জীবন দিয়েছেন এই পরিবারের সদস্য জনাব ইসহাক। রফিকের ভাই আবদুস সালাম ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা। পরম দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন।

মহান ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ রফিকউদ্দিন আহমদকে বাংলাদেশ সরকার মরণোত্তর একুশে পদক (২০০০) দিয়ে সম্মানিত করে।

শামসুজ্জামান খান

স্মৃতিচারণ : শহীদ রফিকউদ্দিন আহমদ প্রসঙ্গ

আহমদ রফিক

"বেলা প্রায় তিনটা সোয়া-তিনটার দিকে ক্ষ্যাপা পুলিশ শেষ পর্যন্ত ঢুকে পড়লো ফুলার রোড থেকে ব্যারাকের গেট দিয়ে। তারপর বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি! কেউ এমনটা ভাবতে পারে নি, তাই বুঝতে পারে নি যে গুলি চলছে, না টিয়ারগ্যাস শেল ফাটছে। পড়ে গেল রফিকুদ্দীন মাথায় গুলি লেগে, মগজ কিছুটা বেরিয়ে রক্তে ঘাসে মাখামাখি। বরকতের তলপেটে গুলি লেগে রক্তে প্যান্ট শার্ট ভিজতে শুরু করেছে। বিশ নম্বর ব্যারাকের সামনে উরুতে গুলি খেল গফরগাঁয়ের চাষীর ছেলে জব্বার। হাসপাতালে ভর্তি আত্মীয়ের দেখাশোনা করতে এসেছিল। পড়ে গেল ব্যারাকের মধ্যে চতুর্থজন সালাম। প্রাঙ্গণের ছেলেরাই ধরাধরি করে তাদের নিয়ে গেল হাসপাতালে ইমারজেন্সিতে, ব্যারাক আর হাসপাতালের দেয়ালের ছোট্ট গেট দিয়ে। ইমারজেন্সি ও অন্যত্র সেবিকাদের আন্তরিকতা আর তৎপরতা। সার্জনদেরও তাই। আমাদের ছেলেরা মরছে। এমনি একটা শোকাহত ভাব প্রত্যেকের। একজন ছাড়া সবাইকে নেওয়া হলো ও.টি.-তে। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে ওরা শহীদের মর্যাদা অর্জন করলো। পুলিশের এই বেপরোয়া কাজের ফলে বুলেটের ক্ষত চিহ্ন বহুদিন বেঁচেছিলো ১২, ১৩, ২০ নম্বর ব্যারাকের গায়ে।"

সূত্র : 'শহীদ মিনার' (বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), রফিকুল ইসলাম

মোবারক আলী খান

[রফিকের ভগ্নিপতি]

"একুশে ফেব্রুয়ারি প্রথম গুলীবর্ষণে রফিক ঘটনাস্থলেই শহীদ হন। গুলী লাগে তাঁর মাথায়। তাঁর মাথার খুলি উড়ে গিয়েছিল। ...রফিকের বয়স ছিল উনিশ বা কুড়ি বছর। তিনি মানিকগঞ্জের দেবেন্দ্র কলেজের আই.কম. দ্বিতীয় বর্ষে পড়তেন। সিঙ্গাইর থানার পারিল গ্রামের মরহুম মোঃ আবদুল লতিফের জ্যেষ্ঠ পুত্র তিনি। শহীদ জননী রাফিজা

খানম এখনও জীবিত। তাঁর বয়স প্রায় ৭৫ বছর। গ্রামেই থাকেন তিনি। ঢাকা থেকে ১৮ মাইল দূরে হলেও শহীদজননী গত ২৮ বছরে একবারও পুত্রের কবর দেখেন নি। কারণ শহীদ রফিককে দাফন করা হয়েছিল আজিমপুর গোরস্থানের অসংরক্ষিত এলাকায়। পরেও তাঁর কবর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়নি বলে সেখানে নতুন কবর পড়েছে।... সাতদিন আগে তাঁর বিয়ের পানচিনি হয়েছে।...”

সূত্র : ‘ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস’ (বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), বশীর আল্‌হেলাল

ড. রফিকুল ইসলাম

১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারিতে যখন গুলী চলে তখন আমি শহীদ মিনারের কাছাকাছি জায়গায় ছিলাম, গুলীর শব্দ শুনে আশ্রয় নিয়েছিলাম ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের মাঝের গাড়ী-বারান্দায়। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন কাজী গোলাম মাহবুব, ইনি একসময় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন ; আর ছিলেন কমরুদ্দীন আহমদ, ইনি বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন। অ্যাপ্রন গায়ে কয়েকজন ওয়ার্ডবয় সেখানে অ্যাম্বুলেন্স থেকে একটি লাশ নামালেন, তাঁরা খুব ক্ষুব্ধ শ্লোগান দিচ্ছিলেন : ‘খুনের বদলে খুন চাই’, ‘রক্তের বদলে রক্ত চাই’ ইত্যাদি। তাঁরা লাশটি গাড়ি থেকে নামালে আমি আর আমানুল হক ছবি তুলেছিলাম। ঐ লাশ* দেখে কাজী গোলাম মাহবুব ও কমরুদ্দীন আহমদ উচ্চস্বরে কাঁদতে থাকেন।

সূত্র : ‘একুশের সংকলন : স্মৃতিচারণ’, বাংলা একাডেমী), ১৯৮১।

---

* ঐ লাশটি ভাষা-আন্দোলনের প্রথম শহীদ রফিকউদ্দিন আহমদের।

দৈনিক আজাদের ২টি প্রতিবেদন :

রফিকউদ্দিন আহমদকে হত্যার প্রতিবাদে মামলার রিপোর্ট

ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে আর একদফা মামলা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোষ্টেল প্রাঙ্গণে রফিকউদ্দিন আহমদকে গুলী করিয়া হত্যা করিবার অপরাধে ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব কোরেশী, সিটি এস. পি. জনাব মাসুদ মাহবুব, ডি. আই. জি. জনাব এ. জেড. ওবায়দুল্লাহ ও জন কয়েক অজ্ঞাতনামা বন্দুকধারী পুলিশের বিরুদ্ধে গতকল্য (শুক্রবার) ঢাকা সদর মহকুমা জনাব এস. আহমদের এজলাসে অভিযোগ করা হইলে তাহা বাতিল হয়। মহকুমা হাকিম বলেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ সকলেই সরকারী কর্ম্মচারী এবং যেহেতু তাঁহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্যে নিযুক্ত থাকাকালীন গুলীবর্ষণের নির্দেশ দিয়াছিলেন সেহেতু সরকারের অনুমোদন ব্যতীত তাঁহাদের বিরুদ্ধে বিচারার্থ কোন অভিযোগ গ্রহণ করা চলে না।

মৃত রফিকউদ্দিন আহমদের মামাত ভাই জনাব মোশাররফ হোসেন খান গতকল্য (শুক্রবার) উপরোক্ত অফিসারদের বিরুদ্ধে সদর মহকুমা হাকিমের এজলাসে অভিযোগ করেন। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, মৃত রফিকউদ্দিন আহমদ মানিকগঞ্জ কলেজে আই. কম. দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী অবধি পড়াশুনা করিবার পরে ঢাকায় তাহার পিতার সহিত থাকিয়া কমার্শিয়াল প্রেসের কাজ দেখাশোনা করিত। ঘটনার দিন আবেদনকারী তাহার ভাই রফিকউদ্দিনের সহিত বকশীবাজার অভিমুখে যাইবার পথে মেডিকেল কলেজ গেটের নিকট আসিলে পুলিশ তাহাদিগকে উত্তর দিকে যাইতে বাধা দেয় ; তখন তাহারা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়া বকশীবাজার অভিমুখে রওনা হয় এবং মেডিকেল কলেজ হোষ্টেলের উত্তর-পশ্চিম দিকের গেটের নিকট পৌঁছিয়া সেখানেও একদল বন্দুকধারী পুলিশকে

প্রহরারত দেখিতে পায়। অতঃপর আবেদনকারী হোষ্টেলের ১৩ ও ১৯ নম্বর শেডের পিছনে দাঁড়াইয়া অপর এক ব্যক্তির সহিত আলাপ–আলোচনা করে ও মৃত রফিকউদ্দিন ২২ নম্বর শেডের বারান্দায় গিয়া দাঁড়ায়। ইহার কিছুক্ষণ পরেই অকস্মাৎ একদল পুলিশ উক্ত হোষ্টেলে প্রবেশ করিয়া গুলীবর্ষণ শুরু করে এবং রফিকউদ্দিন সেই গুলীতে আহত হইয়া ২২ নং শেড হইতে ২০ নম্বর শেডের বারান্দায় গিয়া পড়িয়া যায়। আবেদনকারী বলেন যে, পুলিশের ঐ গুলীর আঘাতেই রফিকউদ্দিনের মৃত্যু ঘটে। আবেদনকারী ইহাও বলেন যে, তাঁহার পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও পুলিশ মৃত রফিকউদ্দিনের পিতার আগমনের অপেক্ষা না করিয়া সেইদিন রাত্রি প্রায় ৩টায় আজিমপুরায় মৃতের লাশ দাফন করে।

বাদী পক্ষে জনাব আতাউর রহমান, জনাব জহিরুদ্দিন, জনাব জমিরুদ্দিন, জনাব এস. এ. রহিম প্রমুখ এবং বিবাদী পক্ষে কোর্ট ইন্সপেক্টর জনাব কাজী জহুরুল হক মামলা পরিচালনা করেন।

আজাদ
২৯ মার্চ ১৯৫২

রফিকউদ্দিনের কবর কোনটি?

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

সুদীর্ঘ পনের বৎসর অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে ; কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে বৃদ্ধ আবদুল লতিফ এবং বৃদ্ধা মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন জানেন নাই যে, তাঁহাদের একান্ত প্রিয়জন ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শহীদ রফিকউদ্দিনের কবর কোন্‌টি।

শহীদ রফিকউদ্দিনের পিতা মরহুম আব্দুল লতিফ প্রিয়তম পুত্রের মৃতমুখ দেখিতে পারেন নাই, এমনকি পুত্রের কবর বহু চেষ্টার পরও খুঁজিয়া পান নাই। তাঁহার মনের এই একান্ত বাসনা পূর্ণ হইবার পূর্বেই তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে জনাব আব্দুল লতিফ এন্তেকাল করেন।

শহীদ রফিকউদ্দিনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জনাব আব্দুর রশিদ এই রিপোর্টারের সহিত এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, তাঁহার পিতা মৃত্যুর পূর্বে দীর্ঘ দশ বৎসর যাবৎ ভ্রাতার কবর খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সফলকাম হইতে পারেন নাই। জনাব রশিদ জানান যে, অনেক চেষ্টার পর তাঁহারা এখন হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন।

অনেক আশা লইয়া মরহুম আব্দুল লতিফ জ্যেষ্ঠপুত্র রফিকউদ্দিনকে জগন্নাথ কলেজে ভর্তি করিবার জন্য মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্রনাথ কলেজ হইতে ঢাকায় লইয়া আসেন এবং পুত্রের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূর মুখ দেখার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। কিন্তু কোনটাই পূর্ণ হয় নাই।

শেষ কথা

১৯৫২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী বুধবার পুত্রকে ঢাকায় রাখিয়া পুত্রের বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি মানিকগঞ্জ গমন করেন। সেই দেখাই শেষ দেখা, পিতা-পুত্রের আর মিলন হয় নাই।

২১শে ফেব্রুয়ারী নিকট আত্মীয়দের নিকট হইতে তারবার্তা মারফৎ তিনি পুত্রের শাহাদৎ বরণের সংবাদ জানিতে পারেন। পরদিনই ঢাকায় ছুটিয়া আসেন। পুত্রকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য। কিন্তু সে আশা তাঁহার সফল হয় নাই। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পুলিশের বেষ্টনী ভেদ করিয়া পুত্রের মৃতমুখ দেখা সম্ভব হয় নাই। এমনকি পিতা জানিতে পারেন নাই কিভাবে কোথায় শহীদ পুত্রের দাফনকার্য সমাধা হইল। শহীদ রফিকউদ্দিনের প্রিয়জনদের মনের আকুতির শেষ নাই। কিন্তু রহস্য এখনও রহস্যই রহিয়া গিয়াছে, সমাধান হয় নাই।

আজাদ
২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭
৮ ফাল্গুন ১৩৭৩
সংকলক : নূরুল ইসলাম

বাংলা একাডেমীতে শহীদ রফিকের মা রাফিজা খানম

১৯৮৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে বর্ধমান ভবন নবায়নের পর আনুষ্ঠানিকভাবে এই ভবন উদ্বোধন করেন শহীদ রফিকের মা রাফিজা খানম।

বিকেল সাড়ে চারটায় বর্ধমান ভবনের পূর্ব দিকের বেদীতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাংলা একাডেমীর কর্মকর্তা জনাব মোতাহার আহমদ ও জনাব মোহাম্মদ মাছোম তাঁকে মানিকগঞ্জ শহর থেকে মাইক্রোবাসে করে নিয়ে আসেন। তিনি অসুস্থ ছিলেন। কয়দিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন।

তাঁকে অভ্যর্থনা জানান একাডেমীর মহাপরিচালক জনাব মনজুরে মওলা। চমৎকারভাবে সাজানো বেদীতে তাঁকে চেয়ারে বসানো হয়। মহাপরিচালকের স্বাগত ভাষণের পর রাফিজা খানম বলেন, 'সকল শহীদের আত্মার শান্তি কামনা করে আমি এই ভবন উদ্বোধন করছি।'

অসুস্থতার কারণে তিনি খুব বেশি কথা বলতে পারছিলেন না। তবু বলেন, 'বাংলা একাডেমীতে আসতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে।' এরপর মৌলভী সাহেব মোনাজাত অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। মোনাজাতের শেষে মহাপরিচালক তাঁকে দুটি লাল গোলাপ উপহার দেন। এরপর তাঁকে বর্ধমান ভবন পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়।

বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে মহাপরিচালক তাঁকে পাঁচ হাজার টাকার একটি চেক প্রদান করেন।

তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর দুই ছেলে। ১৭-০১-১৯৮৯ তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

শহীদ শফিউর রহমান : জীবন-কথা

১৯১৮ সালের ২৪ জানুয়ারি শফিউর রহমান পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত কোন্নগরে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা গভর্নমেন্ট কমার্শিয়াল কলেজ থেকে তিনি আই. কম. পাস করেন। অতঃপর চব্বিশ পরগণার সিভিল সাপ্লাই অফিসে কেরানির চাকরি গ্রহণ করেন। ১৯৪৪ অথবা ১৯৪৫ সালের ২৮ মে কলকাতার তমিজউদ্দিন আহমদের মেয়ে আকিলা খাতুনের সঙ্গে শফিউর রহমান পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। আকিলা খাতুনের বয়স তখন ১২ বছর। পিতা মাহবুবুর রহমান দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঢাকা আসেন। তিনি ঢাকাতে পাকিস্তান পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ অফিসে সুপারিনটেনডেন্ট পদে চাকরি নেন। শফিউর রহমানও তাঁর পিতার সঙ্গে ঢাকা আসেন। ঢাকায় এসে তিনি বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হন এবং ঢাকা হাইকোর্টে হিসাবরক্ষণ শাখায় কেরানির চাকরি গ্রহণ করেন।

শফিউর রহমানের পাঁচ ভাই ছিল। আসজাদুর রহমান নামে তাঁর এক ভাই সলিমুল্লা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি করতেন।

২২ ফেব্রুয়ারি শফিউর রহমান সকাল দশটায় অফিসে রওনা হন। সেদিন পাজামা, শার্ট, গেঞ্জি এবং কোট পরে ছিলেন। পায়ে ছিলো জুতা। সাইকেলে তিনি অফিসে যাতায়াত করতেন। সকাল সাড়ে দশটার দিকে নবাবপুর রোডে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বিক্ষোভরত জনতার উপর পুলিশ বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করে। শফিউর রহমান গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতরভাবে আহত হন। তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। ডক্টর এলিনসন অস্ত্রোপচার করেন। কিন্তু অস্ত্রোপচার সফল হয় নি। ঐদিন সন্ধ্যা সাতটায় হাসপাতালে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

অতি কষ্টে তাঁর লাশ হাসপাতাল থেকে উদ্ধার করা হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যরা মেডিকেল কলেজে ঢুকে অনেক লাশ নিয়ে যায় এবং গুম করে ফেলে। সাহিত্যিক হাবিবুর রহমানের ছেলে মাহবুবুর রহমান (মিটফোর্ডের

ছাত্র) এবং আরো কয়েকজন ছাত্র মিলে শফিউর রহমানের লাশ ঢাকা মেডিকেলের স্টেরিলাইজ ডিপার্টমেন্টে লুকিয়ে রেখেছিল। ২২ ফেব্রুয়ারি ছিল শুক্রবার। শুক্রবার, শনিবার এবং রবিবার এই তিনদিন লাশ তারা লুকিয়ে রেখেছিল। ঢাকা হাইকোর্ট গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক কামালউদ্দিন ঢাকার তৎকালীন এস. ডি. ও.-র নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে মেডিকেল কলেজ থেকে লাশ বের করে আনেন। এস.ডি.ও. প্রথমে অনুমতি দিতে চাননি। কারণ লাশ দেওয়া হলে ছাত্ররা লাশ নিয়ে মিছিল করবে এবং এতে পরিস্থিতি আরো মারাত্মক আকার ধারণ করবে।

২৪ ফেব্রুয়ারি রাত বারোটায় আজিমপুর গোরস্থানে শফিউর রহমানের লাশ দাফন করা হয়। তাঁর গেঞ্জি ও পাজামা রক্তে এত ভিজে গিয়েছিল যে সেগুলি আজিমপুর কবরস্থানে মাটিতে পুতে ফেলা হয়েছিল। তাঁর স্ত্রীর জমানো একশত টাকা দিয়ে কবরের জায়গা কেনা হয়েছিল। শফিউর রহমানের রক্তমাখা শার্ট, কোট, জুতা সংরক্ষণ করা হয়। বর্তমানে এগুলো বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

শফিউর রহমানের এক মেয়ে এবং এক ছেলে। মেয়ে শাহনাজের বয়স তখন মাত্র তিন বছর। মেয়েকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত অবস্থায় তিনি মেয়ের কথা স্মরণ করেন। আহত অবস্থায় তাঁর ডাক্তার ভাইকে তিনি বলেন, "আমার মেয়েকে দেখো। আমি বুঝতে পারছি আমি তার কাছে আর ফিরে যেতে পারব না"। ছেলে শফিকুর রহমান তখন মায়ের পেটে। ১৯৫২ সালের মে মাসে সে জন্মগ্রহণ করে। বর্তমানে মেয়ে বিবাহিতা। তার স্বামী আবু তাহের বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার। ছেলে শফিকুর রহমান র‍্যাংগস লিমিটেডে চাকরিরত।

'৫২-র গৌরবদীপ্ত ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদ শফিউর রহমানকে বাংলাদেশ সরকার মরণোত্তর একুশে পদক (২০০০) প্রদান করে।

শফিকুর রহমান চৌধুরী

স্মৃতিচারণ : শফিউর রহমান প্রসঙ্গ

তৈয়বুর রহমান

শফিউর রহমানের ছোট ভাই

"শহীদ সফিউর ছিলেন হাইকোর্টের একজন কর্মচারী। তিনি ছিলেন বিবাহিত এবং শিশুকন্যার পিতা। শফিউর রহমানের শাহাদাতের তিন মাস পরে তাঁর পুত্রসন্তানের জন্ম হয়, পুত্রের নাম রাখা হয় শফিকুর রহমান। শহীদের পত্নী আকিলা বেগম। ...সকাল ১১টা কি সোয়া ১১টার দিকে তিনি ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন। তখন এক বিরাট মিছিল যাচ্ছিল নওয়াবপুর রোড দিয়ে। মরণচাঁদের দোকানের সামনে (রথখোলা) যখন তিনি, তখন গুলি হয়। গুলি লাগে তাঁর পিঠে। তবুও সাইকেল চালিয়ে তিনি কিছুটা যান, কিন্তু খোশমহল রেস্টুরেন্টের সামনে এসে পড়ে যান।... ঢাকা মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয় এম্বুলেন্সে করে। মা, ভাবী, শাহনাজ (মেয়ে) ও আমি গিয়েছিলাম।... ইশারা করে বড়ভাই মাকে ডাকলেন, দু'হাত বাড়িয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলেন। মায়ের কাপড়ে রক্ত লেগে গেল। এরপর আমাকে ডাকলেন, জড়িয়ে ধরলেন। ভাবী চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন। এরপর ভাইকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হলো। সন্ধ্যার সময় তিনি মারা যান। গুলিতে ভাইয়ের কলজে ছিঁড়ে গিয়েছিল। অপারেশন সফল হয়নি তাই। পুলিশ আমাদেরকে লাশ দেয়নি। সেদিন রাত তিনটায় আজিমপুর গোরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়। তবে অনেক ধরাধরি করে আমরা লাশের কাফন পরিয়ে দিতে পেরেছিলাম।"

শফিউর রহমানের স্ত্রী আকিলা খাতুনের সাক্ষাৎকার :

প্রশ্ন : শহীদ শফিউর রহমান কি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন?

উত্তর : না, আমার স্বামী প্রত্যক্ষভাবে কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও তিনি একজন রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তি ছিলেন। বাসায় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি প্রায়ই আলাপ-আলোচনা করতেন।

প্রশ্ন : ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র-জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ সম্পর্কে শফিউর রহমানের প্রতিক্রিয়া কি ছিল?

উত্তর : শফিউর রহমান ঐ দিন বাসায় ফিরে সবাইকে বলেন, এদেশ আর থাকবে না। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তিনি সেদিন তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি আরো বলেন যে, সভ্যদেশে পুলিশ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে পা লক্ষ্য করে গুলি করে। কিন্তু আজ পুলিশ এলোপাতাড়িভাবে গুলি চালিয়ে ছাত্রদের মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়েছে। কি বর্বরতা! আকিলা খাতুন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন, ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস পরের দিন ২২শে ফেব্রুয়ারি আমার স্বামীও পাকিস্তানীদের গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন।

প্রশ্ন : শফিউর রহমান কিভাবে গুলিবিদ্ধ হন বলে আপনি খবর পান?

উত্তর : ২২শে ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে দশটার দিকে নবাবপুর রোডে মিছিলকারীদের উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। আমার স্বামী মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন, না রাস্তা পাড় হওয়ার সময় গুলিবিদ্ধ হন তা আমি সঠিক বলতে পারব না। দু'জন লোক এসে বাসায় খবর দেয়। আমার শ্বশুর এগিয়ে যান। ওরা বলেন, আমার স্বামীর হাতে গুলি লেগেছে। সত্যি কথাটা তখন বলেনি।

প্রশ্ন : ভাষা-আন্দোলনের শহীদদের প্রতি আপনি কিভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন?

উত্তর : ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারির পর থেকে প্রত্যেক বছর ফেব্রুয়ারি মাসের ২১ ও ২২ তারিখে আমি আমার স্বামী এবং ভাষা-আন্দোলনের অন্যান্য বীর শহীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করে রোজা রাখি। আমি আমার ছেলে-মেয়েকে নিয়ে খালি পায়ে শহীদ মিনারে যাই। প্রকৃতপক্ষে তখনকার দিনে অনেক ছেলে-মেয়ে ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে রোজা রাখত। শহীদদের আত্মার মাগফেরাতের জন্য আমার

আম্মা ও শাশুড়ি ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি দু'দিন রোজা রাখতেন। বুদ্ধি হওয়ার পর আমার মেয়ে শাহনাজও ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি রোজা রাখত। এখনো মাঝে মাঝে রাখে। শাহনাজ একবার শহীদ মিনারে এবং আজিমপুর গোরস্তানে বিশেষ রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে জুতা পরা অবস্থায় দেখে তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করে।

প্রশ্ন : ভাষা-আন্দোলনের শহীদের স্ত্রী হিসাবে সরকার থেকে আপনি কি কোনো আর্থিক সাহায্য পাচ্ছেন?

উত্তর : পাকিস্তান সরকার আমার পরিবারের জন্য মাসিক ৬৪.০০ (চৌষট্টি) টাকা পেনশন বরাদ্দ করে। বাংলাদেশ সরকার এই অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে ১২৫.০০ (একশত পঁচিশ) টাকা করে।

১৯৮০ সালে হঠাৎ করে পেনশনের টাকা বন্ধ হয়ে যায়। পেনশনের বই জমা দেয়ার পর বইতে আমার ছবি না থাকার কারণে ডিপার্টমেন্টের লোকজন পেনশনের টাকা দেয়া সম্ভব না বলে জানায়। আমার পরিবার রক্ষণশীল ও পর্দানশীন হওয়ার কারণে ছবি তোলার অনুমতি পাইনি। তাই ছবিও জমা দিইনি এবং টাকাও নিইনি। ১৯৮৭ সালে তৎকালীন সরকার আমার পরিবারকে প্রতিমাসে পাঁচ হাজার টাকা অনুদান দেয়ার ব্যবস্থা করে।

প্রশ্ন : ১৯৫২ সালের পর আপনার পরিবারের দেখাশোনা কে করেন? ছেলে-মেয়েরা বর্তমানে কি করছে?

উত্তর : ১৯৫২ সালে আমি আমার স্বামীসহ আজাদ সিনেমা হলের নিকট ৬নং রঘুনাথ দাস লেনে বসবাস করতাম। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সেখানে ছিলাম। ১৯৫৮ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত ৭নং বাংলা বাজার (প্যারিদাস লেন) বসবাস করি। অতি কষ্টে ছেলে-মেয়েদের মানুষ করি। কারো কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাইনি। আমার আব্বার সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত কিছু অর্থ আমার আম্মা আমাকে দেন। আমার আম্মা আমাকে এবং আমার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ভীষণ চিন্তা করতেন। তিনিই টাকা দিয়ে আমাদেরকে ১৭৭, বড় মগবাজারে ৪ কাঠা জমি কিনে দেন। হাউজ বিল্ডিং কর্পোরেশন থেকে ঋণ নিয়ে এই জায়গায় একটি ঘর নির্মাণ

করেছি। ১৯৮১ সাল থেকে এখানে বসবাস করছি। আমার মেয়ে শাহনাজ বড় এবং ছেলে শফিকুর রহমান ছোট। মেয়ে বি. এ. পাশ করেছে। তার স্বামী আবু তাহের বাংলাদেশ অক্সিজেন লিঃ- এর জেনারেল ম্যানেজার। ছেলে জগন্নাথ কলেজ থেকে বি. এস. সি. পাশ করেছে। সে বর্তমানে র‍্যাংস লিঃ-এ বিক্রয় বিভাগে চাকুরি করছে। আমার ছেলে-মেয়েরা টেলিভিশনে ছোটদের অনুষ্ঠানে প্রোগ্রাম করতো। অনুষ্ঠান করে বেশ টকা পেত। অনুষ্ঠান থেকে যে টাকা পেত সে টাকা আমি জমাতাম এবং মগবাজারের বাড়ি ভাড়া থেকেও কিছু টাকা পেতাম। এভাবে অতিকষ্টে সংসার চালিয়েছি এবং ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছি।

প্রশ্ন : ভাষা–আন্দোলন থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ এবং এর ফলস্বরূপ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

উত্তর : বায়ান্নর ভাষা–আন্দোলনে যেসব অকুতোভয় ছাত্র–জনতা তাঁদের বুকের তাজা রক্ত দিয়ে মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়েছিলেন তাঁদেরই একজন শহীদের স্ত্রী হিসাবে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। আমার স্বামী রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর ছেলে–মেয়েরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে বসবাস করছে এটি ভেবে আমি ভীষণ আনন্দিত। স্বামী হারিয়ে আমি বাংলা ভাষা এবং একটি দেশ পেয়েছি এর চেয়ে আমার আর গৌরবের বিষয় কি হতে পারে। আমি আমার প্রাণপ্রিয় মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং একটি সুখী, সুন্দর, সমৃদ্ধশালী গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ কামনা করছি।

বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে শফিকুর রহমান চৌধুরী ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ তারিখে এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন। আকিলা খাতুনের বর্তমান বয়স ষাট। তাঁর ঠিকানা : ১৭৭, বড় মগবাজার, ঢাকা।

দৈনিক আজাদের একটি প্রতিবেদন :

যে ছিল মাতৃগর্ভে
তার বয়স এখন চৌদ্দ :
শহীদ শফিউর রহমানের
ছেলে শফিকুর রহমান

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

যে ছেলেটি জন্মের পর বাবাকে দেখে নাই, সে আজ ১৪ বৎসরের কিশোর। যে মেয়েটি ছিল ৪ বৎসরের শিশু, সে আজ ১৮ বৎসরের তন্বী। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শহীদ শফিউর রহমান মাতৃভাষা বাংলার জন্য যে রক্তদান করিয়া গিয়াছেন এই ছেলে ও মেয়েটির ধমনীতে সেই একই রক্ত প্রবাহিত। সকলের অলক্ষ্যে আজ তাহারা বড় হইয়া উঠিয়াছে--বুঝিতে শিখিয়াছে বাবার গৌরব, ভাষার গৌরব।

১৯৫২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী শফিউর রহমান যখন পুলিশের গুলীতে শাহাদাৎ বরণ করেন, তখন পুত্র শফিকুর রহমান মাতৃগর্ভে এবং কন্যা শাহনেওয়াজ মাতৃক্রোড়ে। পুত্র বাবাকে দেখে নাই, কিন্তু গৌরবে তাহার কিশোর বুক স্ফীত। প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারী সকলেই একটি সুদর্শন কিশোরকে এককভাবে শহীদের মাজারে পুষ্প প্রদান করিতে দেখেন। এই কিশোরটি আর কেহই নয়--শহীদ শফিউর রহমানের পুত্র শফিকুর রহমান। অভিজাত রক্ষণশীল পরিবারের সন্তান শাহনেওয়াজ জনারণ্যে শরীক হইতে পারে না সত্যি, কিন্তু দিনটির গুরুত্ব তাহার নিকটও কম নয়। পিতার স্নেহধন্যা শাহনেওয়াজ এবার স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার্থিনী, আর স্নেহ বঞ্চিত শফিকুর রহমান এবার সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। "একজনকে আল্লা লইয়া গিয়াছেন" [এ বাক্যটি উচ্চারণ করলেন শহীদ শফিউর রহমানের পিতা]।

বয়স প্রায় ৭৫ ; কিন্তু শহীদ শফিউর রহমানের পিতা জনাব মাহবুবুর রহমানকে জরায় জীর্ণ করিতে পারে নাই। পুত্রের

গৌরবে একদিকে তিনি যেমন গৌরবান্বিত, অন্যদিকে সমাজের অনাচারে তাঁহার মন ক্ষুব্ধ। তিনি বলেন যে, 'রক্ত দিয়ে বাংলার জন্য কিছু করতে পারি, কিন্তু অবিচারের জন্য নয়।' ১৯৫৩ সালে তিনি সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। শহীদ শফিউর রহমানের স্ত্রী, কন্যা ও পুত্রের লালন–পালনের দায়িত্ব তাঁহারই উপর। তিনি এই রিপোর্টারকে জানান যে, সরকারী সাহায্য তিনি চান নাই, পান নাইও।

জনাব রহমান বলেন যে, "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান শুধু মুখেই বলি নাই, অন্তরেও বলিয়াছিলাম––আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শফিউর রহমানও ছিল এমনই।" তাই আজাদী লাভের পর সবকিছু পেছনে ফেলিয়া পাঁচটি ছেলে লইয়া পাকিস্তানে আসিয়াছিলাম। এর মধ্যে আল্লা একটাকে লইয়া গিয়াছেন।

শহীদ শফিউর রহমানের স্ত্রী আকিলা খাতুনের বয়স বর্তমানে ৩৩ বৎসর। দৃঢ়চেতা এই মহিলার আশা–আনন্দের কেন্দ্রস্থল শাহনেওয়াজ এবং স্বামীর শাহাদাতের কয়েকমাস পর জাত পুত্র শফিকুর রহমান।

অভাব অভিযোগ আছে, সেই সাথে আছে গৌরব এবং সবকিছুর মধ্য দিয়া শহীদ শফিউর রহমানের পনেরোটি বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে।

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী আমি কি ভুলিতে পারি।" কথাগুলি পূর্ব পাকিস্তানের ছয় কোটি মানুষের হৃদয়ের কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু শহীদদের স্মরণ করিতে হইলে শহীদদের রক্তের সহিত যাহাদের বাধন রহিয়াছে, তাঁহাদেরও স্মরণ করার প্রয়োজন রহিয়াছে বৈকি!

আজাদ
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭
৮ ফাল্গুন ১৩৭৩
সংকলক : নূরুল ইসলাম

শহীদ আবদুস সালাম প্রসঙ্গ

ফেনী জেলার দাগনভূঁইঞা উপজেলার লক্ষ্মণপুর গ্রামে ১৯২৫ সালে আবদুস সালাম জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মোহাম্মদ ফাজিল মিয়া। স্থানীয় মাতুভূঁইঞা করিমুল্লা জুনিয়র হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণী এবং দাগনভূঁইয়া কামাল আতাতুর্ক হাই স্কুলে নবম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর চাকরির সন্ধানে ঢাকায় আসেন এবং পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ডিরেক্টরেট অব ইন্ডাস্ট্রিজ বিভাগে পিয়ন হিসাবে চাকরি পান। ঢাকায় ৩৬বি, নীলক্ষেত ব্যারাকে বাস করতেন।

বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ২১শে ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সামনের রাস্তায় সরকার কর্তৃক জারিকৃত ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে ছাত্র-জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। আবদুস সালাম সে বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। পুলিশ মিছিলের উপর গুলি চালালে বিকেল সাড়ে তিনটায় মেডিক্যাল কলেজের সামনে গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি আহত হন। তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ৭ই এপ্রিল '৫২ বেলা সাড়ে এগারটায় তিনি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে আজিমপুর গোরস্তানে দাফন করা হয়।

আবদুস সালাম মহান ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহীদ। তাঁর ও অন্যান্য ভাষা-শহীদের আত্মত্যাগের ফলেই বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি লাভ করে (১৯৫৬)। তাঁর শহীদ স্মৃতি উত্তরকালে বাঙালির জাতীয়চেতনা জাগ্রত করার ক্ষেত্রে দিশারির ভূমিকা পালন করে। এই চেতনার বলেই ১৯৭১-এ বাঙালিরা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে। ২১শে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পাওয়ার (১৭ নভেম্বর ১৯৯৯) পশ্চাতেও রয়েছে সালামসহ অন্যান্য ভাষা-শহীদের আত্মত্যাগ। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে মরণোত্তর একুশে পদক (২০০০) প্রদান করে।

নূরুল ইসলাম

আবদুস সালাম সম্পর্কে ১৯৫৭ সালের ২৯ মার্চ, শুক্রবার সংখ্যায় সাপ্তাহিক সৈনিক-এর রিপোর্ট :

ভাষা আন্দোলনে শহীদ পিয়ন সালাম
ক্ষতিপূরণ দানে সরকারের গড়িমসি

১৯৫২ সালের মহান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে যাঁহারা পুলিশের গুলিতে শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সরকারি অফিসের পিয়ন আবদুস সালামও অন্যতম। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ডিরেক্টোরেট অব ইন্ডাস্ট্রিজ বিভাগে ইডেন বিল্ডিং-এ সালাম পিয়নের কাজ করিতেন। ঢাকায় জনাব সালাম ২৬বি, নীলক্ষেত ব্যারাকে বাস করিতেন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আজ পর্যন্ত জনাব আবদুস সালামের পরিবারকে সরকারের তরফ হইতে কোন ক্ষতিপূরণ দান করা হয় নাই। অথচ অন্য কয়েকটি শহীদ পরিবারকে যৎ সামান্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া সরকারের তরফ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে।

জনাব সালাম ১৯৫২ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে বেলা সাড়ে তিন ঘটিকায় মেডিক্যাল কলেজের সামনে পুলিশের গুলিতে আহত হন এবং ১৯৫২ সনের ৭ই এপ্রিল বেলা সাড়ে এগারটায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

জনাব সালাম নোয়াখালী জিলার ফেনী মহকুমাস্থ লক্ষ্মণপুর গ্রামের অধিবাসী। তাঁহার পিতার নাম মোহাম্মদ ফাজিল মিয়া। তিনি ফেনীর দাগনভূঁইয়া থানার অধিবাসী।

আমরা শহীদ সালামের পরিবারকে অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ দানের জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানাইতেছি।

সংকলক : নূরুল ইসলাম

দৈনিক আজাদের একটি প্রতিবেদন :

একুশের অনুষ্ঠানে শহীদ সালামের পিতা

সমগ্র প্রদেশে শহীদ দিবস উদ্‌যাপিত

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার

প্রভাত ফেরীর পর ছাত্র-জনতা দলে দলে বিভিন্ন প্রকার শ্লোগান প্রদান করিতে করিতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আসিয়া জমায়েত হইতে থাকে। ইহার পর ডাকসুর সহ-সভাপতি জনাব ফেরদৌস কোরেশীর সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় শহীদ সালামের পিতা জনাব ফাজিল মিয়াকে পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। প্রায় ৭০ বছরের বৃদ্ধ এই বয়সে সুদূর নোয়াখালী হইতে ছুটিয়া আসিয়াছেন তাঁহার হাজার হাজার সালামের মধ্যে। তিনি উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন যে, তাঁহার বুক আজ গর্বে ভরিয়া উঠিয়াছে। কেননা প্রদেশের ছাত্র-জনতা সালাম, বরকত, জব্বারের রক্তকে বৃথা যাইতে দেয় নাই। জনতার সম্মুখে তাঁহাকে যখন পরিচয় করাইয়া দেওয়া হইতেছিল, সেই সময় ৭০ বছরের বৃদ্ধ যেন যুবকের রূপলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার চোখে নতুন উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হইতেছিল। ভাষণদানকালে জনাব ফেরদৌস আহমদ কোরেশী অভিযোগের সুরে বলেন যে, এখনও পর্যন্ত অফিস-আদালতে বাংলা ভাষা চালু করা যাইতেছে না কেন ইহাই আজ সরকারের নিকট এদেশের মানুষের জিজ্ঞাস্য। তিনি বলেন, আজ জনসাধারণকেই সর্বস্তরে বাংলার ব্যবহারের জন্য আগাইয়া আসিতে হইবে।

আজাদ
২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭
৯ ফাল্গুন ১৩৭৩
সংকলক : নূরুল ইসলাম

শহীদ আবদুল জব্বার : জীবন-কথা

ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার পাঁচুয়া গ্রামে ১৩২৬ সালের ২৬ আশ্বিন আবদুল জব্বার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ হাছেন আলী ও মাতা সাফাতুন্নেসা। জব্বার ছিলেন পিতা-মাতার প্রথম সন্তান। স্থানীয় ধোপাঘাট কৃষ্ট বাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পরিবারের দারিদ্র্যের কারণে তাঁর শিক্ষা-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। পিতাকে কৃষিকাজে সাহায্য করার জন্য তাঁকে লাঙ্গল নিয়ে মাঠে যেতে হয়। তাঁর স্বভাবের মধ্যে হেঁয়ালি ভাব ছিল। পিতা-মাতার শাসনের ভয়ে মাঝেমাঝে আব্দুল জব্বার বাড়ি ছেড়ে উধাও হয়ে যেতেন। একবার তিনি ঘর থেকে পালিয়ে ট্রেনে চেপে সোজা নারায়ণগঞ্জ চলে আসেন। এ শহরে তাঁর কোনো আত্মীয়-স্বজন বা পরিচিত কোনো লোকজন ছিল না। নিছক অভিমান আর খেয়ালের বশবর্তী হয়েই ট্রেনে উঠে সেখানে চলে আসেন। নারায়ণগঞ্জ জাহাজ ঘাটে এক ইংরেজ সাহেবের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। সাহেব তাঁর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে একটি চাকরি দেন। তাঁর চাকরির কর্মস্থল ছিল বার্মায়। চাকরি সূত্রে তিনি দীর্ঘকাল বার্মায় অবস্থান করেন। ঐ সময় তিনি ইংরেজি ভাষা রপ্ত করেন। একনাগাড়ে দশ/বারো বছর বার্মায় কাটাবার পর একদিন তাঁর জন্মভূমির কথা মনে পড়ে যায়। সেই শস্য-শ্যামল ছায়াঢাকা পাঁচুয়া গ্রাম, বন-বাওড়, পিতার বসত বাড়ির ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর, পিতা-মাতার আদর-যত্নের স্মৃতি আব্দুল জব্বারকে ব্যাকুল করে তোলে।

অবশেষে মায়ের স্নেহের প্রবল টানে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসেন। নিখোঁজ পুত্রকে দীর্ঘকাল পর ফিরে পেয়ে মা সাফাতুন্নেসা আনন্দে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। প্রিয়পুত্রকে তিনি বুকে টেনে নেন। পূর্বেই আবদুল জব্বারের পিতার মৃত্যু হয়েছিল। দেশে ফিরে আবদুল জব্বার ন্যাশনাল গার্ড বাহিনীতে যোগ দেন। তিনি ছোট-খাটো ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। পাঁচুয়া গ্রামের আমেনা খাতুন

নাম্নী এক কন্যার সাথে সাফাতুন্নেসা পুত্রের বিবাহ দেন (১৯৪৯)। তাঁদের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাঁর নাম রাখা হয় নূরুল ইসলাম (বাদল)। এর কিছুকাল পরেই পূর্ব বাংলায় শুরু হয় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। পাকিস্তানের প্রতি আব্দুল জব্বারের আস্থা ছিল না। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পরিচিতজন ও গ্রামবাসীদের সাথে আলোচনাকালে পাকিস্তানকে তিনি ফাহিস্তান বলে উপহাস করতেন। মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রতিও তাঁর সমর্থন ছিল না। বায়ান্নর ফেব্রুয়ারি মাসের ২য় সপ্তাহে আবদুল জব্বার তাঁর অসুস্থ শাশুড়ি উলফতজানকে চিকিৎসার জন্য গ্রামের বাড়ি থেকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। শাশুড়ি কেন্সারাক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ভর্তির ব্যাপারে সহযোগিতা করেছিলেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্র সিরাজুল ইসলাম। জামাতা আব্দুল জব্বার রোগাক্রান্ত শাশুড়ির দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ঢাকার মোগলটুলি বোডিংয়ে প্রতিবেশি আবদুল হাই বনভাওয়ালীর সাথে রাত্রিযাপন করতেন। আমেনা খাতুনও রুগ্ন মাতার সেবা-শুশ্রূষার জন্য শিশুপুত্র নূরুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীর সাথে ঢাকায় এসেছিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল প্রাঙ্গণে হাজার হাজার সংগ্রামী জনতার সমাবেশ ঘটে। আবদুল জব্বারও সেই সমাবেশে যোগদান করেন। আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশ গুলি চালায়। বুলেটবিদ্ধ হয়ে আব্দুল জব্বার গুরুতররূপে আহত হন। তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঐদিন রাতে (২১ ফেব্রুয়ারি '৫২) হাসপাতালে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁকে আজিমপুর গোরস্তানে দাফন করা হয়। শহীদ আবদুল জব্বারের একমাত্র পুত্র নূরুল ইসলাম (বাদল) ১৯৭১ সালের মার্চে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ভারতে চলে যান এবং গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে

অংশগ্রহণ করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর তিনি সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। বর্তমানে সুবেদার মেজর হিসেবে কর্মরত আছেন।

আবদুল জব্বার ৫২-র গৌরবময় ভাষা আন্দোলনের একজন অমর শহীদ। তাঁর ও অন্যান্য ভাষা শহীদের আত্মত্যাগের ফলেই বাংলা ভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি লাভ করে (১৯৫৬)। তাঁর শহীদ স্মৃতি উত্তরকালে পূর্ব বাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে আলোকবর্তিকা হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এই চেতনার ভিত্তিতেই বাঙালিরা ১৯৭১-এ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন করে। ২১ ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি লাভের (১৭ নভেম্বর ১৯৯৯) পেছনে রয়েছে আবদুল জব্বারসহ ভাষা শহীদদের মহান আত্মত্যাগ। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে মরণোত্তর একুশে পদক (২০০০) প্রদান করে।

নূরুল ইসলাম

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ তারিখে দৈনিক সংবাদ-এ প্রকাশিত একটি চিঠি :

শহীদ জব্বারের মায়ের বাসভবন

ঢাকার তেজকুনিপাড়া তেজগাঁও রেলওয়ে কলোনীর এক খণ্ড জমি একটি ছোট ঘরসহ ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার ভাষা শহীদ আবদুল জব্বারের মায়ের নামে বরাদ্দ করেন। এক প্রতারক মহিলা শহীদ জব্বারের নকল মা সাজিয়া উক্ত জমি বরাদ্দের ব্যবস্থা করান এবং দখল বুঝিয়া নেন। পত্রিকায় এই খবর দেখিয়া শহীদ জব্বারের প্রকৃত মা সাফাতুন্নেসা শহীদ জব্বারের একমাত্র পুত্র নূরুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়া ময়মনসিংহের গফরগাঁও হইতে ঢাকায় আসিয়া প্রধানমন্ত্রীর নিকট এই জালিয়াতির কথা জানান। বিস্তারিত তদন্তের পর সরকার প্রতারক মহিলাকে উচ্ছেদ করিয়া শহীদ জব্বারের প্রকৃত মা সাফাতুন্নেসাকে ১৬৫/এ, তেজকুনি পাড়াস্থ একটি ছোট ঘরসহ এক খণ্ড জমির দখল বুঝাইয়া দেন। ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭৮ সালে শহীদ জব্বারের মায়ের মৃত্যুর পর শহীদ জব্বারের একমাত্র পুত্র ও উত্তরাধিকারী নূরুল ইসলাম উক্ত জমি ও ঘরে বসবাস করিতেছেন। উক্ত জমি সংক্রান্ত সরকারি নথিপত্র শহীদ জব্বারের মায়ের নামের স্থলে শহীদ জব্বারের একমাত্র পুত্র নূরুল ইসলামের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া জমি বরাদ্দ করা হউক। রাষ্ট্রপতির সচিবালয় হইতে বহু নির্দেশ দানের পরও ১৭ বৎসর যাবত জমিটুকু শহীদ জব্বারের পুত্রের নামে মালিকানা বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে না। ১৭ বৎসর যাবত রেল মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় ও রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে ফাইল ঘুরাঘুরি করিতেছে। বর্তমানে ফাইলটি ভূমি মন্ত্রণালয়ের আট নম্বর শাখায় রহিয়াছে-- ফাইল নং শা-৮/খা-জ-ব/২৩/৯০ ; ভূমি মন্ত্রণালয় ঢাকার জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কে জমিটুকুর মূল্য সংক্রান্ত মতামত জানাইতে নির্দেশ দিয়াছে প্রায় এক বৎসর পূর্বে, কিন্তু অদ্যাবধি মতামত পাওয়া যায় নাই। ফাইলের

মন্থর গতি ও তদবিরের দুর্বলতার কারণে ১৭ বৎসর অতিক্রান্ত হইতেছে। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে ৩৬ বৎসরেও ইহার সুরাহা হইবে কিনা কে জানে? বিষয়টির দ্রুত নিস্পত্তির জন্য রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ কামনা করিতেছি।

এম. আই. চৌধুরী মুক্তা
সভাপতি, শহীদ জব্বার স্মৃতি পরিষদ
১১৬, পশ্চিম কাফরুল, ঢাকা-১২০৭

শহীদ আবদুল আউয়াল : প্রসঙ্গ

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৯৫২-র ২২শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী ছাত্র-জনতার উপর পুলিশ পুনরায় গুলিবর্ষণ করলে (প্রথম গুলিবর্ষণ হয়েছিল ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২) গুলিবিদ্ধ হয়ে আবদুল আউয়াল শহীদ হন।

পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী আবদুল আওয়াল ২২শে ফেব্রুয়ারি শহীদ হন। তিনি একজন রিকশাচালক। বয়স ২৬ বৎসর। সরকারি বিবরণ অনুযায়ী তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ হাশিম। সে সময়ে আউয়ালের বাড়ির ঠিকানা ছিল ১৯, হাফিজুল্লাহ রোড, ঢাকা।

দৈনিক ইত্তেফাকের একটি প্রতিবেদন :

শহরের বিভিন্ন স্থানে কতিপয়
‘শহীদ মিনার’ নির্মিত
শহীদ আউয়ালের শিশুকন্যা কর্তৃক একটির
ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

অদ্য (মঙ্গলবার) ‘শহীদ দিবসে’ ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদদের অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের প্রস্তুতি কার্যের সমাপ্তি দিবসে ঢাকা নগরীর প্রতিটি মহল্লা কর্মচঞ্চল হইয়া উঠে। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ হইতে

কর্মীরা 'স্কোয়াডে' বাহির হইয়া কালো পতাকা স্কন্ধে নগ্ন পদে প্রতিটি মহল্লা ও কর্মকেন্দ্র পরিভ্রমণ করতঃ শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে শহরের সকল দোকানপাট ও যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখার জন্য অত্যন্ত আবেদনমূলক ধ্বনি তুলিতে থাকে। ইত্যবসরে শহরের বিভিন্ন শিক্ষায়তনের ছাত্রেরা নিজ নিজ শিক্ষায়তন প্রাঙ্গণে শহীদ মিনার গড়িয়া তোলে।

শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে শহরের বালিকা বিদ্যালয়সমূহ সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীগণ এইদিন কালো ব্যাজ বুকে ধারণ করিয়া নগ্নপদে ক্লাশ করে।

গতরাত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ নিজেদের সংগৃহীত অর্থে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নিজ হস্তে একটি শহীদ মিনার গড়িয়া তোলে। এতদ্ব্যতীত নিউ মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের ছাত্রগণ হোস্টেল প্রাঙ্গণে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করিয়াছে।

গতকাল্য করাচী হইতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রত্যাবর্তনের পর প্রচার হইয়া পড়ে যে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের যে স্থানটিতে পুলিশের গুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকত নিহত হইয়াছিলেন, সেখানে সরকার রাতারাতি একটি 'শহীদ মিনার' গড়িবার আয়োজন করিয়াছে। খবরটি প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি বিরাট জনতা ঘটনা সূত্রে ভিড় জমাইয়া দেখিতে পায় যে, জনৈক মন্ত্রী প্রস্তাবিত মিনারটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। জনতা ইহাতে প্রবল আপত্তি জানায়। ফলে মিনার নির্মাণের কাজ কিছুক্ষণ বন্ধ রাখিতে হয় এবং ইত্যবসরে ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহীদ রিকসাচালক আউয়ালের ৬ বৎসর বয়স্কা কন্যা বসিরনকে দিয়া জনতা উহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করায়। রাত্রি ২টায় প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, মিনার তৈরির কাজ অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছে। অদ্য ৯টায় মুখ্যমন্ত্রী উহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিবেন বলিয়া পূর্ববঙ্গ সরকার গতকাল্য প্রেসনোটে প্রকাশ করিয়াছে।

অপরপক্ষে এ. পি. পি. পরিবেশিত এক খবরে বলা হইয়াছে যে, পূর্ত সচিব [মন্ত্রী] জনাব আব্দুস সালাম খান মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য চূড়ান্তভাবে একটি স্থান নির্বাচন করিয়াছেন এবং নির্মাণের একটি উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া উহা যত সত্বর সম্ভব সরকারের নিকট পেশ করার জন্য সরকারী স্থপতিকে নির্দেশ দিয়াছেন।

একদিকে মিনার নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পর মুখমন্ত্রীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং অপরদিকে যথাসত্বর মিনারের পরিকল্পনা পেশের জন্য পূর্ত সচিবের নির্দেশদানের বিষয়গুলির মধ্যে পরস্পর বিরোধিতার যে পরিচয় রহিয়াছে তাহা দুর্বোধ্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গতরাত্রে যে শহীদ মিনারটি নির্মিত হইয়াছে, উহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ সভাপতি এবং বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক জনাব আবদুল মমিন তালুকদার।

ইত্তেফাক
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬
৮ ফাল্গুন ১৩৬২
সংকলক : নূরুল ইসলাম

শহীদ অহিউল্লাহ : প্রসঙ্গ

ভাষা আন্দোলনে শহীদদের তালিকায় অহিউল্লাহ নামক ৮/৯ বছরের একজন বালকের উল্লেখ পাওয়া যায়। অন্য কয়েকজন শহীদের পরিচয়ের সঙ্গে অহিউল্লার মৃত্যুর খবর আছে সাপ্তাহিক 'নতুন দিন'-এর ১৩৬২ সালের ১১ ফাল্গুন সংখ্যায়। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, অহিউল্লাহ্ রাজমিস্ত্রী হাবিবুর রহমানের ছেলে। ২২ ফেব্রুয়ারি নবাবপুর রোডে খোশমহল রেস্টুরেন্টের সামনে ওর মাথায় গুলি লাগে। রাইফেলের গুলিতেই অহিউল্লাহ শহীদ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে লাশ অপসারিত করা হয়।

২৩ ফেব্রুয়ারির 'আজাদ' পত্রিকায় বলা হয় যে, আগের দিন মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল ও পরিষদ ভবনের মধ্যে ফুলার রোডে গুলিতে একজন কিশোর বালক নিহত হয়। এই লাশ সঙ্গে সঙ্গে অপসারিত হয়।

একজন কিশোরের শহীদ হওয়ার কথা অনেকে বলেছেন। কিন্তু তার পরিচয় এর বেশি কিছু জানা যায় না।

সংকলক : নূরুল ইসলাম

একুশের দিনপঞ্জি

১৯৫২

২৭ জানুয়ারি : পল্টন ময়দানের এক বিশাল জনসভায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের নির্লজ্জ ঘোষণা : উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে।

২৯ জানুয়ারি : বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতিবাদ সভা হয়। নাজিমুদ্দিনের স্বৈরাচারী ঘোষণার প্রতিবাদে সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ছাত্ররা সঙ্কল্প গ্রহণ করে।

৩০ জানুয়ারি : ছাত্ররা ধর্মঘট পালন করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে 'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' পুনরুত্থান করে। এদিন সংগ্রামী ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল বের করে। মিছিল শেষে ৪ ফেব্রুয়ারি সমগ্র ঢাকা শহরে ছাত্র-ধর্মঘটের আহ্বান জানান হয়।

৩১ জানুয়ারি : বিকেলে ঢাকার বার লাইব্রেরিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

৪ ফেব্রুয়ারি : বেলা ১১টা থেকে বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা শোভাযাত্রা সহকারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জমায়েত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন গাজীউল হক। সভা শেষে প্রায় দশ হাজার ছাত্রছাত্রী মিছিল করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে করতে শহর প্রদক্ষিণ করে। বিকালে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে জনসভা হয়। এই সভা বাংলাভাষার দাবি

প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম সংগ্রাম চালাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এই দিন ২১ ফেব্রুয়ারি অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সারা প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান দেওয়া হয়।

৬ ফেব্রুয়ারি : মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনে ১২ ও ১৩ তারিখ পতাকা দিবস পালনের প্রস্তাব গ্রহণ করে ও জনসাধারণকে সাধ্য অনুযায়ী অর্থসাহায্য দ্বারা আন্দোলনের অগ্রযাত্রায় সহায়তা করতে আহ্বান জানায়।

১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি : ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে সাফল্যের সঙ্গে পতাকা দিবস পালিত হয়।

২০ ফেব্রুয়ারি : ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ১৪৪ ধারার আদেশ জারি করে এক মাসের জন্য ঢাকা শহরে সভা, শোভাযাত্রা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করে।

২১ ফেব্রুয়ারি : বেলা বারোটার মধ্যে সব স্কুল-কলেজের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে জড়ো হয়। সাড়ে বারোটায় গাজীউল হকের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, দশজন করে ছোট ছোট দল ১৪৪ ধারা ভাঙার জন্য এগিয়ে যাবে।

ছোট ছোট দলে ছাত্ররা বের হয় এবং গ্রেফতার বরণ করে।

ছাত্র জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ শুরু হয়। অপরাহ্ণে ছাত্র-জনতার ওপর গুলি বর্ষণ হয়। ঘটনাস্থলে শহীদ হন রফিকউদ্দিন আহমদ।

রাত আটটায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শহীদ হন আবুল বরকত। সে রাতে আরও শহীদ হন আবদুল জব্বার।

গুলি বর্ষণের খবরে হাজার হাজার মানুষ মেডিক্যাল কলেজে এসে জমা হতে থাকে।

বিকেল তিনটা থেকে পূর্ববঙ্গ বিধান পরিষদ চলছিল। গুলির খবর শোনার পর মওলানা খোন্দকার আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ বলেন, জনাব স্পীকার সাহেব, প্রশ্নোত্তরের পূর্বে আমি আপনার কাছে একটি নিবেদন করতে চাই। যখন দেশের ছাত্ররা, যারা আমাদের ভাবী আশাভরসাস্থল, পুলিশের গুলির আঘাতে জীবনলীলা সাঙ্গ করেছে, সেই সময় আমরা এখানে বসে সভা করতে চাই না। প্রথমে Enquiry, তারপর House চলবে।

পরিষদে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন গুলি চলার সত্যতা স্বীকার করেন, কিন্তু নিহত হওয়ার ঘটনা এড়িয়ে যান।

পরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বসন্তকুমার দাস, মনোরঞ্জন ধর, গোবিন্দ লাল ব্যানার্জী, শাসসুদ্দীন আহমদ প্রমুখ তুমুল বিতর্ক উত্থাপন করেন। এই পরিস্থিতিতে মওলানা তর্কবাগীশ বলেন, যখন আমাদের চক্ষের মানিক, আমাদের রাষ্ট্রের ভাবী নেতা ৬ জন ছাত্র রক্তশয্যায় শায়িত, তখন আমরা পাখার নিচে বসে হাওয়া খাব এ আমি বরদাস্ত করতে পারি না। আমি জালেমের এই জুলুমের প্রতিবাদে পরিষদ গৃহ পরিত্যাগ করছি এবং মানবতার দোহাই দিয়ে আপনার

মধ্যস্থতায় সকল মেম্বরের কাছে পরিষদ গৃহ ত্যাগের আবেদন জানাচ্ছি। এই দিন চট্টগ্রামে সেখানকার সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহ্বায়ক মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী ঢাকায় গুলি চলার খবর পেয়ে 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসীর দাবী নিয়ে এসেছি' নামে একুশের প্রথম কবিতা রচনা করেন।

২২ ফেব্রুয়ারি : বিক্ষোভে, প্রতিবাদে ফেটে পড়ে ছাত্র-জনতা। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে উপস্থিত কয়েক হাজার মানুষ মাইকে 'গায়েবী জানাজা' পড়ে। এদিন সমস্ত শহর মিলিটারির হাতে দেয়া হয়। তবু অল্প সময়ের মধ্যে অসংখ্য মানুষ জানাজায় শরীক হয়।

ইমাম সাহেব মোনাজাতে বলেন, 'হে আল্লাহ্, আমাদের অতি প্রিয় শহীদানের আত্মা যেন চির শান্তি পায়। আর যে জালিমরা আমাদের প্রাণের প্রিয় ছেলেদের খুন করেছে তারা যেন ধ্বংস হয়ে যায় তোমার দেওয়া এই দুনিয়ার বুক থেকে। এই সব ফেরাউনদের খেয়াল-খুশিতে যেন আমাদের সন্তানসন্ততিদের আর জান বলি দিতে না হয়। হে আল্লাহ্, তুমি আমাদের মতো শোকসন্তপ্ত উৎপীড়িতদের মোনাজাত কবুল কর।'

'গায়েবী জানাজা'র পর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অলি আহাদ কর্মপন্থা ঘোষণা করে বক্তৃতা করেন। সভার সভাপতি ইমাদুল্লাহ তাঁর ভাষণে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

সভা শেষে লক্ষাধিক জনতার মিছিল বেরোয়। শোভাযাত্রার সম্মুখভাগে নিহত



১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রস্তুতি

মজলুম জনগণের মুখপত্র

REGD NO : 175

সাপ্তাহিক

চাঁদার হার :—
প্রতি কপি—দুই আনা
বার্ষিক— ৮্
ষান্মাসিক— ৪্
ত্রৈমাসিক— ২্

ইত্তেফাক

THE ITTEFAK

প্রতিষ্ঠাতা : মওলানা আবদুল হামিদ খান (ভাসানী)

তৃতীয় বর্ষ : ২৭শ সংখ্যা } ঢাকা—মঙ্গলবার: ১১ই, ১২ই ফাল্গুন ১৩৫৮ সাল ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ ইং { মূল্য :— পাকিস্তানে—৵০, ভারতে—৵১০

দেশের কাছে লাল ফেব্রুয়ারীর শহীদদের ডাক আসিয়াছে

বাংলা ভাষা সংগ্রামকে সফল করিয়া রক্তের প্রতিশোধ নাও

নূরুল আমিনও প্রতিশ্রুতির পিচ্ছিল পথে পা বাড়াইয়াছে

জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন সরকার আজ মিলিটারীর জোরেই বাঁচিয়া আছে

আবার শহীদের তাজা খুনে ঢাকার রাজপথ রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম্মপরিষদের সাধারণ ধর্ম্মঘটের আহ্বানে ২১শে ফেব্রুয়ারী সমগ্র প্রদেশ প্রস্তুত হইতে থাকিলে সরকারও ইহাকে বানচাল করিবার জন্য বদ্ধমুষ্টিতে আগাইয়া আসে। ঢাকা নগরীতে ১৪৪ ধারা আরোপ করে। আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের উপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলাইয়া দেয়। ইহাতেও আন্দোলনের গতি স্তিমিত হইতেছেনা দেখিয়া সরকার গোলাগুলি, লাঠিসোটা, জেল জুলুম লইয়া রাস্তায় নামে। কিন্তু আন্দোলনের গতি অপ্রতিহত। সরকার শঙ্কিত হইয়া উঠে। তাই অবৈধ ভাবে ২১শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ছুড়ে গ্যাস, ছাত্রদেরে করে গ্রেপ্তার। পরে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গনে বেপরোয়া গুলি চালনা করিয়া অসংখ্য ছাত্রকে করে আহত ও নিহত। টিয়ার গ্যাসে সমস্ত হোস্টেল প্রাঙ্গন দেয় ভরিয়া। এইখানেই শেষ নয়। ২২শে ফেব্রুয়ারী আবার ঢাকার রাজপথ ছাত্র ও জনতার রক্তে প্লাবিত করিয়া দেয়। মিলিটারীর গুলি আর পুলিশের লাঠি ও কাঁদুনে গ্যাস ঢাকার রাজপথে কারবালার সৃষ্টি করে। ঢাকার বুক আজ রাষ্ট্রভাষার দাবীতে অটল ও অগ্রগামী। শোকে বিধুর নয় ক্ষোভে ভরা, রক্তদানে অকাতর নয়—বিদেশের তৈরী গোলাগুলির ক্ষুধা মিটাইতে চির দুর্দ্দম। শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতায়, রক্তের হোলিতে বিচলিত নয়—বিক্ষুব্ধ, বলিষ্ঠ ও বিজয়ের নেশায় পাগল।

ঢাকার রাজপথ আজ মিলিটারীর পাহারায়। কর্মচঞ্চল রাজপথ সর্বত্র নিরবতায় মুখর। দোকানপাট প্রচলিত নিয়মের প্রতি ধার প্রকাশ করিয়া ক্ষুব্ধ বাধার প্রকাশ করিতেছে হরতাল, পূর্ণ হরতাল। তালাবদ্ধ শিক্ষায়তন গুলি ঘোষণা করিতেছে স্কুল কলেজ নয় স্বতন্ত্রতার প্রতিষ্ঠার জন্য রক্তদানের উদ্দেশ্যে সব রাজপথে নামিয়া গিয়াছে। প্রতিক্রিয়াশীল সর্বগ্রাসী মন্ত্রী মা বাপ ঘোষণা করিতেছে যারা আমাদের বুকের ছেলেদের গুলির খোরাক করিয়াছে আমরা তাদের প্রতি ক্ষমাহীন। নীচ ঘৃণ্য কাল রাজপথে রক্তের আখরে লেখাকাটা হইয়াছে রাজপথ রক্তে লাল হইলেও ভাষা আন্দোলন থামিবেনা। শূন্য সরকারী অফিসগুলি ঘোষণা করিতেছে সরকারের রক্তের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য সবে পথ ধরিয়াছে। সেক্রেটারীয়েট



সরকারী প্রস্তুতির এক দিক

পোষ্টাল ডিপার্টমেন্ট ঘোষণা করিতেছে এই জালেমশাহীর খুঁটি হিসাবে আমরা আর নিরবে কাজ চালাইয়া যাইতে পারিবনা। রেডিও শিল্পীরাও রেডিও অফিসের বাহিরে। এমনকি রেল পর্যন্ত সরকারী আজ্ঞাবহন করিতে অসমর্থ। লৌহ যন্ত্রগুলি কিছুতেই চলিবে না। চাকা বন্ধ। হরতাল। সাধারণ হরতাল। ২৩শে ফেব্রুয়ারীও সেই একই অবস্থা।

ঢাকার রাজপথ গাড়ী ঘোড়া শূন্য। বলে হয় শহীদদের পূত রক্তে পবিত্র রাজপথ আজ গাড়ী ঘোড়ার চক্রাঘাতে আর পীড়িত করা যায় না। প্রত্যেকের বুকেই কাল শোকবস্ত্র। যেন তাদের হৃদয়ের জীবন্ত প্রকাশ। অফিস আদালত, কোর্ট কাচারী, ছবিঘর, দোকানপাট, গাড়ীঘোড়া সবই যেন আজ সরকার নির্দিষ্ট বিধানের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতেছে। রাস্তার ঘাটে পোষ্টার আর কার্টুনে সরকারের প্রতি হানলা। বিজ্ঞাপনে বিক্ষোভের অভিব্যক্তি। সকলের বুকেই বিক্ষোভের বহ্নি। এই বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়িয়াছে মর্নিং নিউজ অফিসে, সংবাদের সুরের নীড়ে। মর্নিং নিউজের অফিস আর গাড়ী ভষ্মি আগুনের কথা। ষ্টাইল সংবাদ অফিস আক্রান্ত হইল। বিভিন্ন স্থান হইতে সরকারের শ্রাদ্ধ করিয়া মাইকগুলি প্রচার চালাইতেছে। সরকার আজ যেন সব কিছু হইতে বিচ্ছিন্ন। একমাত্র মিলিটারী ও পুলিশই যেন তাদের সহায়।

পরিষদেও সরকার বিপ্রত্ন। মুসলিম লীগ দলে ভাঙ্গন। আজাদ

(৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শহীদ ছাত্রদের তাজা রক্তে রাজধানী ঢাকার রাজপথ রন্‌জিত

মেডিক্যেল কলেজ হোষ্টেলে ছাত্র সমাবেশে নির্বিচারে পুলিশের গুলীবর্ষন

---::---::---

বৃহস্পতিবারেই ৭ জন নিহত : ৩ শতাধিক আহত : ৬২ জন গ্রেপ্তার
শুক্রবারেও বহু সংখ্যক লোক হতাহত

রক্তের বিনিময়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার শপথ বিঘোষিত

২১শে ফেব্রুয়ারী—রক্তাক্ত ২১শে ফেব্রুয়ারী। এই দিন বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবীতে পূর্ববঙ্গ সরকারের পুলিশ বাহিনী নিরীহ ও নিরস্ত্র জনতাকে গুলী বর্ষন করিয়া ঢাকার রাজপথ ও মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাস প্রাঙ্গন রক্তরঞ্জিত করে। অপরাহ্ন চার ঘটিকায় ভয়াবহ পুলিশী অভিযান শুরু হয়। এই সময় গুলীর আওয়াজে সমস্ত এলাকা মুহুর্মুহু প্রকম্পিত হইয়া উঠে এবং কাঁদুনে গ্যাসে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট এলাকা ধুম্রাচ্ছন্ন হইয়া যায়।

প্রত্যক্ষ দর্শীর বিবরনে প্রকাশ, বৈকাল চারি ঘটিকায় পুলিশ মেডিক্যেল কলেজ হোষ্টেল প্রাঙ্গনে বিক্ষোভ রত ছাত্রদের উপর গুলী বর্ষনের উদ্দেশ্যে মেডিক্যেল কলেজ হোষ্টেলের গেট ডিঙ্গাইয়া দ্রুতবেগে হোষ্টেলের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করে ও বেপরোয়া ভাবে গুলী বর্ষন করিতে থাকে। ফলে ১২নং শেডের বারান্দায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্র সালাহুদ্দিন গুলীবিদ্ধ হইয়া সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায়। গুলীর আঘাতে তাঁহার মাথার খুলী উড়িয়া যায়। তাহার রক্তে ১২নং শেডের প্রশস্ত অঙ্গন রঞ্জিত হইয়া যায়। গুলীর আঘাতে হোষ্টেলের অন্যান্য কয়েকটি শেডের বারান্দায়ও কয়েকজন ছাত্রকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। কয়েকটি বুলেট দেওয়াল ভেদ করিয়া ১২নং শেডের কামরার মধ্যে প্রবেশ করে। সৌভাগ্য বশতঃ তখন ঐ কামরায় কেহ ছিলনা। কয়েকটি কামরার ভিতরে রক্তের দাগ এখনো বিদ্যমান রহিয়াছে।

আপনার রক্ত দিন

আজকের হত্যাকাণ্ডে আহত বন্ধুরা রক্তের অভাবে মেডিক্যাল হাসপাতালে মরতে বসেছে। আপনি দয়া করে ব্লাডব্যাঙ্কে রক্ত দান করে তাঁদের বাঁচা ন।

তমদ্দুন মজলিসের প্রতিবাদ

পাক তমদ্দুন মজলিসের কেন্দ্রীয় দফতর এক বিবৃতি যোগে বলেছেন :—

২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ছাত্র সমাবেশের উপর যে নৃশংস পুলিশি জুলুম চালানো হইয়াছে, তাহার নিন্দা করিবার ভাষা আমাদের নাই। আমরা এই দুষ্কার্য্যের সহিত জড়িত প্রতিটি অপরাধীর আশু তদন্ত ও শাস্তির দাবী জানাচ্ছি। শহীদানের শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। ....আজ জনসাধারণকে শুধু এই শপথই নিতে হবে—বাংলা-ভাষার দাবীর পূর্ণ স্বীকৃতি এবং পুলিশী নৃশংসতার প্রতিবিধান না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এ সংগ্রামের বিরাম নেই।

২৩শে ফেব্রুয়ারী-তেও লাঠি চার্জ

আবার ইসলামপুরে এবং সেক্রেটারীয়েটের সামনে পুলিশ জনতার উপর লাঠি চার্জ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। আহতদের চিকিৎসা হাসপাতালে দেওয়া হইয়াছে। বিগত দুই দিনের অমানুষিক হত্যাকাণ্ডে সারা শহরময় তীব্র বিক্ষোভ বিরাজমান। "মর্নিংনিউজ" অফিস পোড়াইয়া দেওয়া সত্বেও আবার একটি প্রেস হইতে বাহির হইয়াছে। আজকার "মর্নিং নিউজে" বিগত দুইদিনের ঘটনাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা ভাবে বিকৃত করিয়া সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়াছে। "মর্নিংনিউজ" অফিসের চারিদিকে আজ কড়া মিলিটারী পাহারা দেওয়া হইয়াছে। রেলওয়ে রেডিও এবং সেক্রেটারীয়েটে পূর্ণ ধর্মঘট চলিতেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ইহাই বৃহত্তম ধর্মঘট এবং গণ আন্দোলন। সারা শহর পূর্ববৎ মিলিটারী পাহারার অধীনে রহিয়াছে। শহরকে মিলিটারীর ছাউনি বলিয়া মনে হইতেছে। এম, এম হল থেকে মাইক যোগে রাষ্ট্রভাষার স্বপক্ষে জোর প্রচার চলিতেছে।

রক্তাক্ত ঐতিহাসিক ২১শে ফেব্রুয়ারী পুর্ণ বিবরন

২১শে ফেব্রুয়ারী, সকাল হইতে শহরের বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে জমায়েত হইতে থাকে। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে শান্তিপূর্ণভাবে এক সভার আয়োজন হয়। প্রাঙ্গনে সভা চলিতে থাকার সময় হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্দিকে রাইফেলধারী পুলিশ সমাবেশ শুরু হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গন হইতে ছাত্রগণ বেলা ১১টার সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া রাস্তায় বাহির হইতে থাকে। এই সময় পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ফলে কিছু সংখ্যক ছাত্র দৌড়াইয়া গিয়া রাস্তার অপর পার্শ্বে বিশ্ববিদ্যালয় ময়দানে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং কিছু সংখ্যক ছাত্রকে দৌড়াইয়া মেডিকেল কলেজের দিকে যাইতে দেখা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সমবেত ছাত্ররা কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই সময় ভাইসচ্যান্সেলার পুলিশের নিকট বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কাঁদুনে বোমা নিক্ষেপের প্রতিবাদ জানান।

এর পর ভাইসচ্যান্সেলারের অনুরোধ ক্রমে ছাত্ররা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া শান্তিপূর্ণভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিতে শুরু করে। কিন্তু পুলিশ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া ছাত্রদের বেপরোয়া গ্রেপ্তার করিতে থাকে।

পুলিশ ৬২জনকে গ্রেপ্তার করিয়া ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আটক করে

শেষ পাতায় দেখুন

২২শে ফেব্রুয়ারীতে ৭ জন নিহত ও ৩০০ জন আহত

সৈনিক
২৩শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার দাম দুই আনা।
শহীদ সংখ্যা ৩য় পর্য্যায়

Regd. No. D. A 82.

পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল সাপ্তাহিক—

NAU-BELAL

নওবেলাল

৫ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, সিলেট, বৃহস্পতিবার, ২৪শে মাঘ, ১৩৫৮বাং; 7th February 1952 বার্ষিক—৫৲; ষান্মাসিক—৩৷৹; প্রতি সংখ্যা—

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ঢাকায় দশ সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রীর শোভাযাত্রা

রাষ্ট্র-ভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য সর্ব্বদলীয় কর্ম্ম পরিষদ গঠিত

উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা এবং আরবী অক্ষরে বাংলা-

খাজা নাজিমুদ্দিনের সাফাই

পূর্ব পাকিস্তান সফরের পর উজিরে আজম জনাব খাজা নাজিমুদ্দীন ৩১শে জানুয়ারী ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, তিনি পল্টন ময়দানে যে বক্তৃতা

পাকিস্তান কম্যুনিষ্ট ও কাশ্মীর

নিখিল পাকিস্তান কম্যুনিষ্ট লেবার সেক্রেটারী ডাঃ [illegible] [illegible] এক বিবৃতিতে [illegible] [illegible] সম্পর্কে [illegible] [illegible] [illegible] কম্যুনিষ্ট পার্টি [illegible] [illegible] হইয়াছে।

তিনি বলেন যে, পাকিস্তান পার্টি ভারত ও পাকিস্তান [illegible]

East Bengal Secondary Education Board,
Dacca.

MATRICULATION EXAMINATION

I certify that Rufiquddin Ahmed

of Baira H.E. School, aged 17 years months

on the 1st of March, 1948, duly passed the Matriculation Examination held in the

month of May, 1948, and was placed in the Third Division.

EAST BENGAL SECONDARY EDUCATION BOARD DACCA

DACCA.

The 6th NOV. 1949.

Controller of Examinations.



১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হল প্রাঙ্গণে
নির্মিত শহীদ মিনার



১৯৫৩ সালে প্রকাশিত একুশের প্রথম সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারী'



১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার ইডেন গার্লস কলেজ প্রাঙ্গণে শহীদ মিনার
নির্মাণরত ছাত্রীদের কলেজ-অধ্যক্ষা ফজিলতুন্নেসা কর্তৃক বাধাদান

ও আহতদের রক্তমাখা জামাকাপড় দেখানো হয়।

শোভাযাত্রায় লাঠিচার্জ করার পরও জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে না পেরে পুলিশ গুলি চালায়। হাইকোর্টের কর্মচারী শফিউর রহমান নওয়াবপুর রোডে শহীদ হন।

অন্যদিকে সকাল ৯টায় জনসাধারণের এক বিরাট অংশ 'মর্নিং নিউজ' অফিস জ্বালিয়ে দেয়।

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে রেলওয়ে কারখানায় ধর্মঘট ঘোষিত হয়। বেলা ১১টা পর্যন্ত রেল চলাচল বন্ধ থাকে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পরিষদে মুসলিম লীগ সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ও তার জন্যে গণ-পরিষদের কাছে সুপারিশ করার প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন গুলি চালনার প্রতিবাদে বিধান পরিষদের সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেন।

২৩ ফেব্রুয়ারি : আগের দিনের মতো পূর্ণ হরতাল পালিত হয়।

নাজিরাবাজার পশু হাসপাতালের কাছে জনতার উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে। ৪ জন আহত হয়।

এদিনের প্রধান ঘটনা রেল-ধর্মঘট। বেলা ১টা পর্যন্ত ধর্মঘট চলে। ঢাকা রেল-স্টেশনের কর্মচারীরা হরতাল পালন করে।

সলিমুল্লাহ হলে গায়েবানা জানাজা হয় বেলা দু'টোয়। প্রায় তিন হাজার লোক যোগদান করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর, সলিমুল্লাহ হলের প্রভোস্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন।

বিকেলে শেরে-বাংলা এ.কে. ফজলুল হক মুসলিম হলের সভায় ছাত্রদেরকে শান্তি বজায় রাখতে বলেন। ছাত্রদের দাবিকে জয়যুক্ত করবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সারা রাত কাজ করে ছাত্ররা একটি শহীদ মিনার গড়ে তোলে। আজকের শহীদ মিনার যেখানে তার কাছাকাছি মিনারটি তৈরি হয়েছিল।

২৪ ফেব্রুয়ারি : এদিন ঢাকার অবস্থা কিছুটা শান্ত। শহরে রিকশা আর ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া আর সব যান চলাচল বন্ধ থাকে। ইসলামপুর রোডে এবং রেল-স্টেশনে জনতার ওপর পুলিশ মৃদু লাঠিচার্জ করে। গত চারদিন ঢাকা বেতার কেন্দ্রে পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়। কেবল সংবাদ বুলেটিন ছাড়া অন্য কোনো অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় নি।

এদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিল ও অধ্যাপক-দের দু'টি সভা হয়। উভয় সভায় বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো হয়।

রাষ্ট্রভাষা সর্বদলীয় কর্মপরিষদের সভা হয়। কর্মপরিষদ সাময়িকভাবে ধর্মঘট তুলে নেয়। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি পূরণের জন্য সরকারকে ৫ মার্চ পর্যন্ত সময় দেয়। ৫ মার্চের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে আবার হরতাল চলবে বলে চরমপত্র দেয়া হয়। ৫ মার্চ প্রদেশব্যাপী 'শহীদ দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ৯ দফা দাবির ভিত্তিতে

সরকারের নিকট নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন দাবি করা হয়।

২৫ ফেব্রুয়ারি : সকাল থেকে সলিমুল্লাহ হল প্রাঙ্গণে ছাত্র ও জনসাধারণ জমায়েত হয়। অনেককে মাইকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার এবং অবিলম্বে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বক্তৃতা করতে দেখা যায়। বেলা ১১টার দিকে পুলিশ ও ই.পি.আর. সলিমুল্লাহ হল থেকে মাইক নিয়ে যায়। অন্যান্য হল থেকেও পুলিশ মাইক ছিনিয়ে নেয়।

২৬ ফেব্রুয়ারি : এদিন মেডিক্যাল হোস্টেল প্রাঙ্গণে নির্মিত শহীদ মিনার পুলিশ ভেঙে দেয়।

ভোরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টর মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও ড. বি. সি. চক্রবর্তী এবং জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক অজিতকুমার গুহকে গ্রেপ্তার করা হয়। বেলা আড়াইটায় সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে খানা–তল্লাশী হয়।

২৭ ফেব্রুয়ারি : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজিকিউটিভ কমিটির সভায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের অবিলম্বে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়। ছাত্ররা হল ত্যাগ করে চলে যায়।

সেলিনা হোসেন

শহীদ মিনার : নির্মাণের কথা

১. ১৯৫৬ সালের শরৎকালে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ সরকার ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে শহীদ মিনার নির্মাণের জন্য দেশের শিল্পী ও স্থপতিদের কাছ থেকে নক্সা আহ্বান করে।

২. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, এম. এ. জব্বার (তদানীন্তন চিফ ইঞ্জিনিয়ার) ও ডক্সিয়াডেস (গ্রিক স্থপতি)–এর সমন্বয়ে গঠিত কমিটির ওপর নক্সা নির্বাচনের দায়িত্ব দেয়া হয়।

৩. শিল্পী হামিদুর রাহমান শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের অনুরোধে কমিটির কাছে একটি নক্সা জমা দেন। নক্সার সঙ্গে ৫২টি ড্রয়িং এবং আরো বেশ কিছু সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পেশ করেন।

৪. নির্বাচকমণ্ডলী হামিদুর রাহমানের নক্সাটি নির্বাচন করেন।

৫. সরকার উপর্যুক্ত নক্সাটি অনুমোদন করে।

৬. সরকার অনুমোদিত নক্সা অনুসারে ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে শহীদ মিনারের নির্মাণ কাজ শুধু হয়।

৭. ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণের যে স্থানে আবুল বরকত শহীদ হয়েছিলেন সেই স্থানটি শহীদ মিনার স্থাপনের জন্য নির্বাচিত হয়। পূর্ববঙ্গের কৃষক-শ্রমিক পার্টির কোয়ালিশন সরকার (৭ জুন ১৯৫৫–৩০ আগস্ট ১৯৫৬)–এর পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী আবদুস সালাম খান ১৯৫৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনারের এই স্থান নির্বাচন করেন।

৮. পরদিন ২১ ফেব্রুয়ারি মুখমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

৯. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও শহীদ বরকতের মা হাসিনা বেগম এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

১০. ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভার পতন হয়। পরে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ দলীয় কোয়ালিশন সরকার শহীদ মিনারের নির্মাণ কাজে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করে।

১১. ১৯৫৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শহীদ মিনারের ভিত, মঞ্চ ও তিনটি স্তম্ভের নির্মাণ কাজ শেষ করা হয়।

১২. মিনারটিকে সুন্দর ও কারুকাজখচিত করে গড়ে তোলার জন্য পূর্ববঙ্গ সরকার মূল্যবান পাথর ও মনোরম কাঁচের জন্য ইতালিতে অর্ডার দেয়।

১৩. মিনারের ব্যয় ধরা হয় ৩ লক্ষ টাকা।

১৪. ১৯৬০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ করার কথা হয়।

১৫. শিল্পী হামিদুর রাহমান ও ডক্সিয়াডেস নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধানে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকেন।

১৬. প্রায় এক বছরকাল (১৯৫৭-৫৮) সময়ের মধ্যে হামিদুর রাহমান মিনারের নিচের দু'পাশের বেইসমেন্টে ১০০০ বর্গফুট ম্যুরাল অঙ্কন সমাপ্ত করেন।

১৭. ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সামরিক আইন জারির পর সামরিক সরকার শহীদ মিনারের নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেয়।

১৮. হামিদুর রাহমান দেশ ত্যাগ করে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান।

১৯. তিনি যতটুকু কাজ করেছেন তাতে দেখা যায় মিনারটি উত্তরমুখী। বেদির দক্ষিণপ্রান্তে পৃথকভাবে অর্ধবৃত্তাকারে পাঁচটি স্তম্ভ দণ্ডায়মান। উচ্চতায় ও প্রশস্তে মাঝখানের স্তম্ভটির আকৃতি বড় এবং তার উপরিভাগ উত্তরদিকে নোয়ানো। স্তম্ভটির উচ্চতা ২৭ ফুট। এর উত্তর-পশ্চিম পাশে পূর্বদিকে মুখ করে একটি স্তম্ভ ও উত্তর-পূর্ব পাশে পশ্চিমদিকে মুখ করে আর একটি স্তম্ভ। ডান পাশের দ্বিতীয় স্তম্ভটির উত্তর-পূর্ব পাশে পশ্চিমদিকে মুখ করে একটি স্তম্ভ ও বাম

পাশের দ্বিতীয় স্তম্ভটির উত্তর-পশ্চিম পাশে পূর্বদিকে মুখ করে অপর একটি স্তম্ভ দণ্ডায়মান। দু'পাশের দ্বিতীয় স্তম্ভ দু'টি দৈর্ঘ্যে মাঝারি এবং এদের দু'পাশের তৃতীয় স্তম্ভ দু'টি দৈর্ঘ্যে ছোট। স্তম্ভগুলোর আকৃতি চতুষ্কোণ ফ্রেমের মতো। সবগুলো স্তম্ভ কংক্রিটের তৈরি।

স্তম্ভগুলোর ফাঁকা অংশ লোহার মোটা শিক দিয়ে আঁটা।

২০. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে সেনাবাহিনী শহীদ মিনার ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন।

২১. ১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার শহীদ মিনার পুনর্নির্মাণ করে।

২২. ১৯৮৬ সালে তৎকালীন সরকার মঞ্চের ও বেদির আয়তন বাড়িয়ে শহীদ মিনারের সংস্কার করে।

২৩. তবে এই সংস্কারসাধন ও পুনর্নির্মাণে হামিদুর রাহমান প্রণীত মডেল পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়নি।

সুকুমার বিশ্বাস

একুশে ফেব্রুয়ারি : শহীদ দিবস ঘোষণা

১৯৫৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গের আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট সরকার একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'শহীদ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে একুশে ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবেও স্বীকৃতি দেয়। এ সংক্রান্ত বিষয়ে 'দৈনিক ইত্তেফাকে' ১৭ই ফেব্রুয়ারি (১৯৫৬) তারিখে প্রকাশিত রিপোর্ট :

"পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী জনাব আবু হোসেন সরকার গতরাত্রে (বৃহস্পতিবার) নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছেন :

আমি দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করা সত্ত্বেও কতিপয় সংবাদপত্র সরকারের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ ও বিদ্বেষ প্রচার করিয়া জনসাধারণকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করিতেছে। যাহারা এই ইস্যুকে কেন্দ্র করিয়া রাজনৈতিক মূলধন তৈরির কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, তাহারা প্রকৃতপক্ষে দেশের কিংবা জনগণের কল্যাণ করিতেছেন না। আমি পরিস্কার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিতেছি যে, ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'শহীদ দিবস' ও সরকারি ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহা বিশেষভাবে পরিতৃপ্তির বিষয় যে, যে দাবির বেদীমূলে আমাদের শহীদগণ আত্মাহূতি দিয়াছিলেন, অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে বাংলার স্বীকৃতির মাধ্যমে শাসনতন্ত্রে সেই দাবির নির্ভুল অভিব্যক্তি রহিয়াছে।

'আমি ছাত্র সমাজ ও জনসাধারণকে মরহুমদের আত্মার পরকালীন শান্তি কামনা করিয়া সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার নিকট মোনাজাত করিতে অনুরোধ করিতেছি এবং তৎসঙ্গে যে সকল বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী বিক্ষোভকারীরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছেন তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি এবং জনগণেরও তাহাদের সম্পর্কে সতর্ক হওয়া উচিত।"

আইয়ুব খানের সামরিক সরকার ১৯৫৯ সালে এই ছুটি-দিবস বাতিল করে দেয়। ১৯৬৯ সালে গণ–আন্দোলনের মুখে পূর্ব পাকিস্তান সরকার পুনরায় একুশে ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটি দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এ বিষয়ে ১৭ ফেব্রুয়ারি (১৯৬৯) তারিখে ‘দৈনিক পাকিস্তানে’ প্রকাশিত রিপোর্ট :

“পূর্ব পাকিস্তান সরকার আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারিকে প্রদেশব্যাপী সরকারি ছুটিদিবসরূপে ঘোষণা করেছে।

’৫২ সালের অমর বাংলা ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদদের স্মরণে একুশে ফেব্রুয়ারিকে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ অবিলম্বে শহীদ দিবসরূপে ঘোষণার দাবি জানিয়েছিল।

১৯৫৬ সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা একুশে ফেব্রুয়ার্রিকে ছুটি-দিবস ঘোষণা করেছিল এবং সামরিক শাসন জারীর [১৯৫৮]... পরে এই ছুটিদিবস বাতিল করা হয় [১৯৫৯]।

এবার পুনরায় ঐদিন সরকারি ছুটি ঘোষিত হল।”

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এ পর্যন্ত যথাযোগ্য মর্যাদায় একুশে ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ও শহীদ দিবস রূপে পালিত হচ্ছে।

সংকলক : নূরুল ইসলাম

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী কর্মসূচি : একুশ দফা

নীতি : কোরান ও সুন্নার মৌলিক নীতির খেলাফ কোনো আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।

১। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হইবে।

২। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হইবে এবং উচ্চ হারের খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হইবে। এবং সার্টিফিকেটযোগে খাজনা আদায়ের প্রথা রহিত করা হইবে।

৩। পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে উহাকে পূর্ববংগ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করিয়া পাটচাষীদের পাটের ন্যায্য মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আমলের পাট কেলেংকারী তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৪। কৃষির উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে ও সরকারী সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হইবে।

৫। পূর্ববংগকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য সমুদ্র উপকূলে কুটির শিল্পের ও বৃহৎ শিল্পের লবণ তৈয়ারীর কারখানা স্থাপন করা হইবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আমলের লবণের কেলেংকারী সম্পর্কে তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৬। শিল্পী ও কারিগরি শ্রেণীর গরীব মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইবে।

৭। খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থ্য করিয়া দেশকে বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

৮। পূর্ববংগকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করিয়া ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হইবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

৯। দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন এবং শিক্ষকদের ন্যায়সংগত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১০। শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করিয়া শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকরী করিয়া কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠাইয়া দিয়া একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া সকল বিদ্যালয়কে সরকারী সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১১। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল ও রহিতপূর্বক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া উচ্চশিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা হইবে এবং ছাত্রাবাসে অল্প ব্যয়সাধ্য ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হইবে।

১২। শাসনব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে উচ্চ বেতনভোগীদের বেতন কমাইয়া নিম্ন বেতনভোগীদের আপাততঃ বেতন বাড়াইয়া তাহাদের আয়ের একটি সুসংগত সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে। যুক্তফ্রন্টের কোনো মন্ত্রী এক হাজার টাকার বেশি বেতন গ্রহণ করিবেন না।

১৩। দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, ঘুষ-রিসাওয়াত বন্ধ করার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। এবং এতদুদ্দেশ্যে

সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী পদাধিকারী ও ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত মুদ্দতের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ লওয়া হইবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে না পারিলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

১৪। জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যাস প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিত করতঃ বিনাবিচারে আটক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হইবে এবং সংবাদপত্র ও সভা-সমিতি করিবার অধিকার অবাধ ও নিরংকুশ করা হইবে।

১৫। বিচার-বিভাগকে শাসন-বিভাগ হইতে পৃথক করা হইবে।

১৬। যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়িতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবেন এবং বর্ধমান হাউসকে আপাততঃ ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে।

১৭। বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে যাঁহারা মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার গুলিতে শহীদ হইয়াছেন, তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হইবে এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

১৮। ২১শে ফেব্রুয়ারীকে শহীদ দিবস ঘোষণা করিয়া উহাকে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করা হইবে।

১৯। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববংগকে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন ও সার্বভৌমিক করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় (অবশিষ্টাত্মক ক্ষমতাসমূহ) পূর্ববংগ সরকারের হাতে আনয়ন করা হইবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থল বাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তানে ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণের কারখানা নির্মাণ

করতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হইবে। আনসার বাহিনীকে সশস্ত্রবাহিনীতে পরিণত করা হইবে।

২০। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা কোনো অজুহাতেই আইন পরিষদের আয়ু বাড়াইবে না। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়া নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবে।

২১। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হইবে, তিন মাসের মধ্যে তাহা পূরণের জন্য উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে। এবং পরপর তিনটি উপ-নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবে।

পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে কিছু খবর :

সরকারী প্রেসনোট

গতকল্য (সোমবার) পূর্ববঙ্গ সরকারের এক প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, সরকার শহীদ মিনার নির্মাণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অদ্য (২১শে ফেব্রুয়ারি) সকাল ৯টায় মুখ্যমন্ত্রী জনাব আবু হোসেন সরকার উহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিবেন। মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল গেটের নিকটে এই মিনার নির্মাণ করা হইবে। এতদ্ব্যতীত ১৯৫২ সালের আন্দোলনে যাঁহারা প্রাণবিসর্জন দিয়াছেন, তাঁহাদের পরিবারবর্গকে উপর্যুক্ত পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

নিমন্ত্রণ জানাইবার সময় না থাকায় প্রেসনোট মারফৎ ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সকলকে অনুরোধ জানানো হইয়াছে।

নির্মাণকার্য সমাপ্ত হওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে মিনারটির উদ্বোধন করা হইবে। এ.পি.পি. পরিবেশিত সংবাদে প্রকাশ, পূর্ববঙ্গের পূর্ত সচিব [মন্ত্রী] জনাব আবদুস সালাম খান সরকারি ইঞ্জিনিয়ারদের লইয়া গতকল্য (সোমবার) মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল প্রাঙ্গণে যাইয়া শহীদ মিনার নির্মাণের স্থান চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করিয়াছেন।

মিনারের একটি নক্সা প্রস্তুত করিয়া যথাশীঘ্র সম্ভব সরকারের নিকট দাখিল করিবার জন্য সরকারি ইঞ্জিনিয়ারদের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ইত্তেফাক
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬
৮ ফাল্গুন ১৩৬২

রাষ্ট্রভাষা শহীদদের জন্য সরকারী সাহায্য

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ভাষা আন্দোলনে পুলিশের গুলীবর্ষণের ফলে নিহত জনাব রফিক, জনাব আবুল বরকত, জনাব আবদুল জব্বার এবং জনাব আবদুস

সালামের পরিবারবর্গের জন্য পূর্ব পাকিস্তান সরকার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ২ হাজার টাকা করিয়া সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

ইত্তেফাক
৬ ডিসেম্বর ১৯৫৬
২০ অগ্রহায়ণ ১৩৬৩

শহীদ মিনারের নির্মাণ

দ্রুতগতিতে কাজ আরম্ভ

পূর্ব পাকিস্তান সরকার একটি নয়া নক্সা অনুসারে মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রাবাস (পুরাতন) প্রাঙ্গণে শহীদ মিনারের নির্মাণকার্য আরম্ভ করিয়াছে। প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান করাচী হইতে টেলিগ্রামযোগে এই শহীদ মিনারের নক্সা প্রণয়ন এবং নক্সা মোতাবেক কাজ আরম্ভ করার নির্দেশ দেন। ফলে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া এই শহীদ মিনারের নির্মাণকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে।

জানা গিয়াছে যে, বিদেশ হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ শিল্পী জনাব হামিদুর রাহমানের প্রণীত নক্সা প্রাদেশিক সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। শহীদ মিনারটিতে ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামের এক মূর্ত অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইবে। সমগ্র মিনারটিতে ইসলামী ও আধুনিক ভাস্কর্য শিল্পের মিলিত স্বাক্ষর থাকিবে। ইহার সিঁড়িগুলি মার্বেল পাথরের হইবে এবং সম্মুখস্থ দুইটি বৃক্ষকে মিনারের প্রবেশ দ্বার হিসাবে ব্যবহার করা হইবে। বৃক্ষ দুইটির ব্যবধান হইবে ৬২ ফুট।

ইত্তেফাক
২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭
১১ ফাল্গুন ১৩৬৩

শহীদ মিনারের উদ্বোধন
ছাত্রনেতাদের সভায় কর্মসূচী গ্রহণ

(ইউনিভারসিটি রিপোর্টার)

শহীদ মিনারের উদ্বোধন কে করিবেন এই প্রশ্নে সম্প্রতি ছাত্রনেতাদের মধ্যে যে সকল বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হইয়াছিল, গতকল্য সোমবার বৈকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়ন অফিসে কলেজ এবং হল ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের এক সভায় উহার অবসান হয়। সভার সিদ্ধান্তক্রমে ভাষা আন্দোলনের শহীদ বরকত ও সালাম--এঁদের মাতা-পিতাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ জনকে শহীদ মিনার উদ্বোধনের জন্য অনুরোধ জানান হইবে। অনিবার্য্য কারণে তাঁহারা অনুপস্থিত থাকিলে উপরোক্ত শহীদদের যেকোনো ছেলে বা মেয়ে দ্বারা উদ্বোধন সম্পন্নের জন্যও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আজাদ
১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩
৬ ফাল্গুন ১৩৬৯

আজ শহীদ দিবস : অমর
২১ শে ফেব্রুয়ারীর ঋণ পরিশোধ
কি শুধু মিনার নির্ম্মাণের মধ্যে সমাপ্ত হইবে?
ইংরেজীর দৌরাত্মে মাতৃভাষার মর্য্যাদা অপমানিত নেতা ও রাষ্ট্রনায়কদের কাছে পাঁচ কোটি নরনারীর জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা

(ইউনিভার্সিটি রিপোর্টার)

ভাষার দাবিতে শহীদদের রক্তরাঙা ঐতিহ্যের গৌরবদীপ্ত স্মৃতিবিজড়িত অমর ২১শে ফেব্রুয়ারী আজ পূর্ব্ব পাকিস্তানের সর্বত্র উদ্‌যাপিত হইবে। এই দিনে নারী-পুরুষ, ছাত্র-অছাত্র, বালক-বৃদ্ধ ও যুবা নির্ব্বিশেষে পূর্ব্ব পাকিস্তানের পাঁচ কোটি নরনারীর একটি মাত্র জিজ্ঞাসা-- "বাংলা ভাষার স্বীকৃতি ও মর্য্যাদা আমাদের জন্য শহীদদের

আত্মাহুতির ঋণ কি শুধু মিনার নির্ম্মাণের মাধ্যমেই পরিশোধ করা সম্ভব?”

আজ হইতে ১১ বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্বপাকিস্তানের পাঁচ কোটি মানুষের প্রাণের ভাষা বাংলার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যাঁহারা একদিন আত্মত্যাগ করিয়াছেন, অদ্য বৃহস্পতিবার প্রদেশের সর্বত্র সেই অমর একুশে ফেব্রুয়ারী যথাযোগ্য মর্য্যাদার সহিত উদ্‌যাপনের জন্য ব্যাপক কর্ম্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে।

প্রাণের ভাষা বাংলার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য প্রদেশের জনসাধারণ ও ছাত্রসমাজ এ যাবত যে বিরামহীন আন্দোলন চালাইয়াছেন এবং বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলনের শহীদদের পবিত্র স্মৃতি রক্ষার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের পার্শ্বে একটি শহীদ মিনার স্থাপনের যে দাবিটি জানাইয়া আসিতেছিলেন, নানা ঘাত, প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া এই বৎসর উহার নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

এই মিনার স্থাপনের দাবি শুধু মাত্র একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণের দাবি নয়, ইহা হইতেছে পূর্ব্ব পাকিস্তানের অপামর জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের রক্তরাঙা দাবি।

মিনার নির্ম্মাণ সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জনমনে প্রশ্ন জাগে, ভাষা আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের অধিকারী একুশে ফেব্রুয়ারীর ঋণ পরিশোধ কি কেবলমাত্র এই মিনার নির্ম্মাণের মধ্য দিয়াই শেষ হইবে?

আরও প্রশ্ন জাগে, বাংলা ভাষার পূর্ণ মর্য্যাদা দেওয়ার জন্য যে আন্দোলন শুরু হইয়াছিল, তাহা কি পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে?

এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে, বাংলা ভাষা অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা লাভ করিয়াও অদ্যাবধি সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃত হয় নাই।

আজও বাংলা ভাষার মর্য্যাদা গোলামির যুগের ইংরেজী ভাষার প্রভুত্বের দ্বারা অপমানিত। প্রদেশের একমাত্র বাংলা কলেজ সরকারী ঔদাসীন্যের মুখে চরম আর্থিক সংকটের সম্মুখীন।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, বাংলা ভাষার মর্য্যাদা দিতে গিয়া ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে আমরা এ পর্য্যন্ত কি করিয়াছি ও কতখানি আন্তরিক সমর্থন যোগাইয়াছি এবং আমাদের জাতীয় সরকারই বা এই পর্য্যায়ে কতখানি কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে দেখা গিয়াছে, একুশে ফেব্রুয়ারীর দাবী দাওয়াগুলিকে নামকা-ওয়াস্তে জিয়াইয়া রাখিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল ইহাকে কোন দলীয় প্রচারের বাহন হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছেন।

অদ্যকার কর্ম্মসূচী

সকাল ৫-১৫ মিনিটে বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কালো পতাকা উত্তোলন।

সকাল ৫-৩০ মিনিটে প্রভাত ফেরী।

সকাল ৬-৩০ মিনিটে কবর জিয়ারত। কবরস্থান হইতে শোভাযাত্রা সহকারে শহর প্রদক্ষিণ ও শোভাযাত্রাশেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সভা। দ্বিপ্রহরে বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির ও গির্জায় শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা। বেলা ২-৩০ মিনিটে কার্জন হলে আলোচনা সভা ও একুশে স্মরণে গীতি নক্সা। সন্ধ্যা ৭টায় কার্জন হলে মিলাদ মহফিল।

লেখক সঙ্ঘের শপথ

পাকিস্তান লেখক সঙ্ঘ অদ্য ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছে। এই পবিত্র দিনে লেখকরা পাকিস্তানের গৌরবের জন্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবায় নিজেদের পুনরায় উৎসর্গ করার দৃঢ়সঙ্কল্পের কথা ঘোষণা করিতেছেন।

আজাদ
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩
৮ ফাল্গুন ১৩৬৯
সংকলক : নূরুল ইসলাম

হামিদুর রাহমান : শহীদ মিনারের রূপকার

হামিদুর রাহমান ১৯২৮ সালে ঢাকার ইসলামপুরে জন্মগ্রহণ করেন। নাট্যকার সাঈদ আহমদ ও সংস্কৃতিসেবী নাজির আহমদ তাঁর ভাই। এক উচ্চ মধ্যবিত্ত 'ঢাকাইয়া' পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা মির্জা ফকির মোহাম্মদ এবং পিতৃব্য মির্জা আবদুল কাদের সর্দার। ঢাকার সরকারি আর্টস স্কুল (বর্তমানে বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা ইন্‌স্টিটিউট)-এ চিত্রকলার উপর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন (১৯৪৮-৫০)। অতঃপর চিত্রশিল্পে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ইউরোপ গমন করেন। ১৯৫০-৫১ সালে প্যারিসের 'ইকোল দ্য বোজ আর্টস'-এ চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করেন। এরপর লন্ডনের 'সেন্ট্রাল স্কুল অব আর্টস অ্যান্ড ডিজাইন'-এ ভর্তি হন। ঐ ইন্‌স্টিটিউশন থেকে চিত্রকলায় ডিপ্লোমা লাভ করে ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

হামিদুর রাহমান শহীদ মিনারের রূপকার। তাঁর নকশা (মডেল) অনুসারে ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে শহীদ মিনারের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ১৯৫৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে শহীদ মিনারের ভিত, মঞ্চ ও তিনটি স্তম্ভের নির্মাণ কাজ শেষ করা হয়। ১৯৬০ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার কথা ছিল। ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারির পর আইউব খানের সামরিক সরকার শহীদ মিনারের নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেয়। হামিদুর রাহমান দেশ ত্যাগ করে যুক্তরাষ্ট্র চলে যান। তিনি আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া রাজ্যের 'পেনসিলভানিয়া একাডেমী অব ফাইন আর্টস'-এ রিসার্চ স্কলার হিসেবে প্রায় এক বছর চিত্রকলার ওপর গবেষণা করেন (১৯৫৯-৬০)। পরবর্তী জীবনের প্রায় সাড়ে তিন দশক যুক্তরাজ্য, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে অতিবাহিত করেন। তিনি কানাডার মন্ট্রিয়ালে ম্যাকডোনাল্ড কার্টিলার পলিটেকনিকে চারুকলার অধ্যাপনা করতেন।

হামিদুর রাহমানের মডেল অনুসারে (সংশোধিত আকারে) শহীদ মিনারের নির্মাণ কাজ ১৯৬২ সালে পুনরায় আরম্ভ করা হয়। এক বছরের মধ্যে এ কাজ সম্পূর্ণ হয়। ১৯৬৩

সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে মিনারের উদ্বোধন করা হয়। শহীদ আবুল বরকতের মাতা হাসিনা বেগম কালো ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে মিনারের উদ্বোধন করেন। ইট-সুরকির মঞ্চের উপর পাঁচটি স্তম্ভের সমাহারে মিনারটি নির্মিত হয়েছে। মিনারটি উত্তরমুখী। বেদীর দক্ষিণ প্রান্তে পৃথকভাবে অর্ধবৃত্তাকারে পাঁচটি স্তম্ভ দণ্ডায়মান রয়েছে। উচ্চতায় ও প্রশস্তে মাঝখানের স্তম্ভটির আকৃতি বড় এবং তার উপরিভাগ উত্তর দিকে নোয়ানো। বড় স্তম্ভটির উত্তর-পশ্চিম পাশে পূর্বদিকে মুখ করে একটি স্তম্ভ ও উত্তর-পূর্ব পাশে পশ্চিম দিকে মুখ করে আর একটি স্তম্ভ, আবার ডানপাশের দ্বিতীয় স্তম্ভটির উত্তর-পূর্ব পাশে পশ্চিম দিকে মুখ করে একটি স্তম্ভ ও বামপাশের দ্বিতীয় স্তম্ভটির উত্তর-পশ্চিম পাশে পূর্বদিকে মুখ করে আর একটি স্তম্ভ দণ্ডায়মান রয়েছে। দু'পাশের দ্বিতীয় স্তম্ভ দু'টি দৈর্ঘ্যে মাঝারি এবং এদের দু'পাশের তৃতীয় স্তম্ভ দু'টি দৈর্ঘ্যে ছোট। মাঝখানের বড় স্তম্ভটির দৈর্ঘ্য প্রায় ২৭ ফুট। স্তম্ভগুলোর আকৃতি চতুষ্কোণ-ফ্রেমের মতো। সবগুলো স্তম্ভ কংক্রীটের তৈরি। স্তম্ভগুলোর ফাঁকা অংশ লোহার মোটা শিক দিয়ে আঁটা।

স্তম্ভগুলোর ভেতর দিয়ে শিল্পী হামিদুর রাহমান ভাষা আন্দোলনের তথা বাঙালির সংগ্রামী চেতনাকে শাশ্বত রূপ দিয়েছেন। স্তম্ভগুলো গভীর অর্থবহ। মাঝখানের বড় স্তম্ভটি মা তথা মাতৃভূমি এবং তার দু'পাশের অপর চারটি স্তম্ভ মা'র শহীদ সন্তানদের তথা জাতীয় বীরদের প্রতীক। অর্ধবৃত্তাকারে মা তার শহীদ সন্তানদের নিয়ে দণ্ডায়মান আছে। যে জাতীয় বীরেরা মা'র অর্থাৎ মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করার জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছে সেই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আত্মত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে মা তার মাথা নুইয়ে দেশের লক্ষ কোটি সন্তানকে অবলোকন করছে। শহীদ মিনারের ভাস্কর্যের রূপকল্পের ভেতর দিয়ে হামিদুর রাহমান বাঙালির আবেগ ও সংগ্রামের এবং বীরত্ব ও আত্মদানের ইতিহাসকে সার্থক রূপ দিয়েছেন।

চিত্রকর হিসেবেও হামিদুর রাহমান দেশে-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছেন। দেশ, কাল ও সমকালীন জীবনের সকল

জটিলতা ও সমস্যা তাঁর চিত্রের ক্যানভাসে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ১৯৭০-এর ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসের ধ্বংসযজ্ঞ, পাক-হানাদার বাহিনীর নারী নির্যাতন ও গণহত্যা, বন্যার প্রলয়ঙ্করী রূপ ও ধ্বংসযজ্ঞ, বানভাসী মানুষের আত্মরক্ষার সংগ্রাম, বাঙালির জীবন ও জীবিকার প্রাত্যহিক কর্মপ্রবাহ তাঁর চিত্রকলায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। বিদেশে বাস করেও তিনি দেশজ ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করেননি। দেশের মানুষ, মাটি আর প্রকৃতিকে বাস্তবতার নিরিখে আত্মস্থ করে একগুচ্ছ তীক্ষ্ণ রেখা আর আকর্ষণীয় রঙের সাহায্যে চিত্রমালায় রূপ দিয়েছেন।

হামিদুর রাহমানের চিত্রকর্মের চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে দেয়াল চিত্র (মুর‍্যাল) অঙ্কনেও। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে ১৭০০ বর্গফুট মুর‍্যাল অঙ্কনের ভেতর দিয়ে তিনি তাঁর শিল্পানুরাগের সার্থক প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সিমেন্টের সাথে রং মিশিয়ে তিনি এই চিত্তাকর্ষক মুর‍্যাল অঙ্কন করেছেন। গ্রাম বাংলার মানুষের জীবনাচরণ এগুলোতে চিত্রায়িত হয়েছে। জেলে, মাছ, জাল, কৃষক, গৃহবধূ, নদী, হরিণ, দ্রুতগামী অশ্ব ইত্যাদি প্রতীকের ভেতর দিয়ে তিনি পল্লী বাংলাকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

১৯৭৩ সালে লন্ডনের কমনওয়েলথ ইন্‌স্টিটিউট গ্যালারিতে হামিদুর রাহমানের একটি একক চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর তাঁর অঙ্কিত চিত্রগুলো প্রদর্শিত হয়। লন্ডনের দর্শকেরা এই প্রথমবারের মতো চিত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতিফলন দেখতে পায়। ১৯৮৬ সালে ঢাকার শিল্পকলা একাডেমীতে তাঁর একক চিত্র প্রদর্শনীর শেষ অনুষ্ঠানটি হয়।

হামিদুর রাহমান ১৯৮৮ সনের ১৯শে নভেম্বর (৩রা অগ্রহায়ণ ১৩৯৫) কানাডার মন্ট্রিয়ালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। বিমানযোগে তাঁর লাশ ঢাকায় আনা হয় এবং আজিমপুর গোরস্তানে সমাহিত করা হয়।

নূরুল ইসলাম